ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৬ ও ১০৭ (যুক্ত), ডিসেম্বর ২০২৫
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10607016

শহীদুল জহিরের ছোটগল্প: পরিবেশ-নারীবাদী পাঠ

কানিজ ফাতেমা*

Abstract: The legendary storyteller Shahidul Zahir has left a legacy of creative excellence through his few yet significant body of work that has elevated the standard of Bangladeshi short stories to a unique level. Notably, nature and women occupy a significant place in his short stories and create new frontiers of possibilities for critical thinking and artistic freedom. Zahir in his writings exhibit how women and nature often function parallelly; sometimes, they even complement one another. It is to be noted that ecofeminism focuses on women and nature as subjects to patriarchal exploitation and according to the theory, the oppression of women and the exploitation of nature are interconnected. Ecofeminism stands firm against such oppression by emphasising cooperative relationships among men, women, and nature. Based on these considerations, the article explores the treatment of women and nature in Shahidul Zahir's short stories through the lens of the ecofeminist theory. Therefore, it employs a textual and thematic analysis within the framework of ecofeminist theory to examine how women and nature are represented in Zahir's short fiction. The findings indicate that Zahir's narratives not only reveal the interconnected oppression of women and nature under patriarchy but also envision alternative modes of harmony and liberation through cooperative relations. Thus, an ecofeminist reading of Zahir's short stories offer new interpretive horizons that not only enriches literary analysis but also opens up new perspectives on social justice, environmental awareness and gender equality.

মুখ্যশব্দ: শহীদুল জহির, পরিবেশ নারীবাদ, অধস্তন নারী, অমানবীয় প্রকৃতি, অপরতাবোধ, কেন্দ্র/প্রান্ত, কণ্ঠস্বরের বিনির্মাণ, মানবীয় সত্তায় উত্তরণ।

বিশ্বসাহিত্যে পরিবেশ-নারীবাদ (Eco-feminism) একটি গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন সমালোচনামূলক প্রবণতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে নারী, সমাজ ও প্রকৃতির

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পারস্পরিক সম্পর্ককে তাত্ত্বিক কাঠামোয় বিশ্লেষণ করা হয়। পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য ও পুঁজিবাদী আগ্রাসনের ফলে নারী যেমন শোষণ-নিপীড়নের শিকার, তেমনি প্রকৃতিও মানুষের প্রভুত্বপরায়ণ মানসিকতায় লাঞ্ছিত ও বিনষ্ট হয়। ফলে নারী ও প্রকৃতি উভয়ই হয়ে ওঠে 'অপর' বা 'প্রান্তিক' সত্তা। তবে পরিবেশ-নারীবাদ কেবল শোষণকে চিহ্নিত করেই থেমে যায় না; বরং নারী ও প্রকৃতির সৃজনশীল, প্রতিপালনমূলক শক্তিকে স্বীকৃতি দিয়ে সহযোগিতামূলক ও সাম্যনির্ভর সামাজিক কাঠামোর সম্ভাবনা নির্মাণ করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিংবদন্তীতুল্য গল্পকার শহীদুল জহিরের ছোটোগল্পগুলিতে এই তত্ত্বের প্রয়োগ সম্ভব। কারণ তাঁর গল্পে নারী ও প্রকৃতির উপস্থিতি নতুন তাৎপর্যে উন্মোচিত হয়; নারী ও প্রকৃতির নতুন নির্মিতি এবং স্বতন্ত্র স্বর প্রতিফলিত হয়। পিতৃতন্ত্রের কর্তৃত্বপরায়ণ মানসিকতায় নারী ও প্রকৃতির অধস্তনতার রূপ যেমন চিত্রিত হয়, তেমনি পিতৃতান্ত্রিক অনুশাসনের বাইরে গিয়ে জহির নারী ও প্রকৃতিকে কেন্দ্রীয় ও মানবিক সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য শহীদুল জহিরের ছোটোগল্প পরিবেশ-নারীবাদী তত্ত্বের আলোকে পাঠ ও বিশ্লেষণ করলে কেবল তাঁর সৃষ্টিশীল বৈশিষ্ট্যই নয়, বরং নারী ও প্রকৃতির উপস্থাপনা, তাদের সাদৃশ্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক, পিতৃতান্ত্রিক শোষণ ও আধিপত্যবাদ বিরোধী সামাজিক সচেতনার প্রকাশ, নারীর স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর এবং প্রকৃতির মানবিক প্রতিফলন প্রভৃতি দিক উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

তত্ত্বকথা

বিশ্বমানবের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে নারীবাদ (Feminism) শৃঙ্খলিত নারীর মুক্তির পরিসর নির্মাণের পাশাপাশি পরিবেশবাদী ভাবনাকে এর চিন্তাপরিসরে যুক্ত করে। নারীবাদের এই ভাবাদর্শ এবং অভিপ্রায় পরিবেশ-নারীবাদ বা ইকোফেমিনিজম (Eco-Feminism) নামে পরিচিত। যদিও, "নারীবাদের বিস্তৃত ধারার (উদারনৈতিক নারীবাদ, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ, মার্কসবাদী নারীবাদ, কৃষ্ণাঙ্গ ও তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদ) মধ্যে পরিবেশ নারীবাদের শিকড় প্রোথিত রয়েছে; তা সত্ত্বেও অমানবিক প্রকৃতি ও প্রকৃতিবাদের মতো নারীবাদী বিষয়সমূহের সংযোগ পরিবেশ-নারীবাদকে স্বতন্ত্র করে তোলে।" (Warren, 2014 , p. 04) পরিবেশ-নারীবাদ নারী, সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ককে তাত্ত্বিক রূপ দেয়। এ তত্ত্বে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নারী ও প্রকৃতিকে অভিন্ন রূপে দেখা হয়। এই অভিন্নতা একদিকে পুরুষ কর্তৃক নিপীড়ন, অন্যদিকে সৃষ্টি ও প্রতিপালন ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। নারী যেমন পুরুষতান্ত্রিকতার কারণে নানাভাবে নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়, একইভাবে পরিবেশ-প্রকৃতিও নানাভাবে মানুষের দ্বারা শোষিত হয়। (Gruen, 1993, p. 60), (Shiva & Mies, 1993, p. 05), (Warren, 2014, p. 04), (Birkeland, 1993, p. 18-19) আবার, প্রকৃতি সৃষ্টি ও লালনের বিষয়টিও নারীর সাথে সম্পৃক্ত। কেবল সৃষ্টির প্রবণতায় নয়, নারী নিজেও সৃষ্টিশীল সত্তা। সন্তান জন্মদানের মধ্য দিয়ে সে সৃষ্টি করে ও প্রতিপালন করে।

একইভাবে প্রকৃতির পরিচর্যা ও বিকাশ ও রক্ষার ক্ষেত্রেও নারী বিশেষ ভূমিকা পালন করে।[১] এ বিষয়ে সমালোচক সুদক্ষিণা বসুর মন্তব্যটি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। তাঁর মতে:

> ক্ষমতা ও বাণিজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে একধরনের আগ্রাসনের মনোবৃত্তি কাজ করে তার বিপরীতে আছে নারীর সৃজন ও লালন ক্ষমতা। নারী তার শারীরবৃত্তীয় কারণেই এবং অনেকটা সামাজিক অভ্যাসের অনুশীলনে প্রাণকে ধারণ করে তার গতিকে ব্যহত না করে তাকে আরও বিকশিত করে তোলে, সে গ্রাস করে না, কিন্তু প্রাণধারাকে নিজস্ব নিয়মে বিকশিত হতে দিয়ে তার প্রয়োজন মেটায় (সুদক্ষিণা, ২০২৪, পৃ. ১৯৭)।

নারীর এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত মেরুতে পুরুষের অবস্থান। পুরুষ তার আধিপত্যকামী মানসিকতার দরুন এবং তথাকথিত উন্নয়নের ধারণায় প্রকৃতিকে বিনষ্ট করে যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেয়। এ কারণে পরিবেশ-নারীবাদ মুনাফালোভী পুঁজিবাদী শিল্পায়নকে পিতৃতন্ত্রের আরেক চেহারা হিসেবে চিহ্নিত করে[২] এবং পিতৃতন্ত্র ও আগ্রাসী পুঁজিবাদের আধিপত্যকামী প্রবণতাকে প্রত্যাখ্যান করে নারীর ন্যায্য অধিকার ও পরিবেশ রক্ষার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

আশির দশকে পরিবেশ-নারীবাদ সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে ওঠে। এ আন্দোলনে পরিবেশবিদ, পরিবেশ নীতিবিদ ও বিভিন্ন নারীবাদী যুক্ত হয়। ১৯৭৪ সালে ফরাসি লেখক ফ্রাঁসোয়াজ দ্যুবোন (Francoise d'Eaubonne) (১৯২০–২০০৫) তাঁর *Le Feminisme ou la mort* (নারীবাদ অথবা মৃত্যু) গ্রন্থে 'পরিবেশ নারীবাদ' প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে নারী নিপীড়ন ও প্রকৃতি বিনষ্টিকরণের বিষয়টি সমসূত্রে গাঁথা বলে মতপ্রকাশ করেন। পিতৃতন্ত্র যেমন করে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করে, একইভাবে প্রকৃতিকেও গ্রাস করে– এমন মত প্রকাশ করেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে মারি ড্যালি (Mary Daly) (১৯২৮–২০১০) লেখেন '*Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism*' (১৯৭৮)। এছাড়া ক্যারোলিন মার্চেন্ট (জ. ১৯৩৬) তাঁর *Death of nature: women, ecology and the scientific revolution* (১৯৮০), ক্যারেন জে ওয়ারেন (১৯৪৭–২০২০), ভেল প্লামউড (১৯৩৯-২০০৮), গ্রেটা গার্ড (জ. ১৯৬০), বন্দনা শিবা (জ. ১৯৫২), মারিয়া মাইজ (১৯৩১–২০২৩), মারে বুকচিন (১৯২১-২০০৬) প্রমুখ পরিবেশ-নারীবাদ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখালেখি করেন। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে নারীবাদের একটি শাখা হিসেবে পরিবেশ নারীবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরিবেশ নারীবাদীদের মতবাদের মধ্যে বৈপরীত্য থাকলেও সকলেই পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করেন। কেননা পুঁজিবাদী সভ্যতা যে আধিপত্যের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছে তার কেন্দ্রে পুরুষের অবস্থান। পরিবেশ নারীবাদীরা মনে করেন,

আধিপত্যের ধারণায় পুরুষের বিপরীতে নারী ও প্রকৃতির সমান্তরাল রেখায় অবস্থান করে। উভয়ই পুরুষ কর্তৃক আগ্রাসিত, নিপীড়িত। পুরুষেরা কেবল নারীর ওপরই শোষণ-নিপীড়ন চালায় এমন নয়; প্রকৃতির ওপরও পুরুষের নিপীড়নমূলক আচরণ সমানভাবে স্বীকার্য। পিতৃতান্ত্রিক হেজিমনির কারণে পুরুষ গণ্য হয় 'মূল' বা 'কেন্দ্র' হিসেবে, নারী ও প্রকৃতি প্রতিভাত হয় 'প্রান্ত' বা 'অপর' হিসেবে।[৩] পুরুষ-সংস্কৃতি/নারী-প্রকৃতি এই বৈপরীত্য ও পরাতাত্ত্বিক ধারণার মধ্যে রয়েছে অপরায়ণ (otherness)-এর অস্তিত্ব। এজন্য নারী ও পুরুষের সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক ও সাংঘর্ষিক। একইভাবে নারীকে প্রকৃতি হিসেবে কিংবা প্রকৃতিকে মাতৃরূপে দেখা বা কল্পনার ফলে প্রকৃতিকে নারীর মতো ভোগের আওতায় আনা হয়। ফলে প্রকৃতির অপব্যবহার ও প্রকৃতির প্রতি পুরুষের কর্তৃত্বপরায়ণ মানসিকতায় 'প্রকৃতি' চিহ্নিত হয় 'আদার' বা 'অপর' সত্তারূপে। পরিবেশ নারীবাদ নারী ও প্রকৃতির মাঝে এই সাদৃশ্য খুঁজে পায় এবং নারী ও প্রকৃতির ওপর পুরুষতান্ত্রিক আগ্রাসনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চায়; সমাজে নারীর অবস্থানকে বা বৈষম্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, নারী-পুরুষের দ্বান্দ্বিক অবস্থানকে বিশ্লেষণ করে এবং সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সহযোগিতামূলক সম্বন্ধ ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই বৈশিষ্ট্যের আলোকে পরিবেশ-নারীবাদের নিম্নলিখিত প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ নির্ণয় করা যায়:

১. মানব সমাজের বিভিন্ন প্রান্তিকায়িত বর্গ এবং সর্বজনীন নিসর্গ-প্রকৃতির অবদমন একইসূত্রে গ্রথিত। তাই যাঁরা সার্বিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের অতি অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে আগ্রাসী পুঁজিতন্ত্র এবং নিসর্গ-বিনাশকারী অপশক্তির হিংস্র আঁতাতের বিরুদ্ধে।

২. আধিপত্য বিস্তারের হিংস্র সংস্কৃতিকে প্রতিরোধ করতে হবে প্রীতি, সহমর্মিতা যত্ন ও সংবেদনশীলতার নৈতিক বীক্ষা দিয়ে।

৩. সমস্ত ধরনের অত্যাচারই পরস্পর-সম্পৃক্ত এবং সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যানযোগ্য। পৃথিবীকে যদি মানুষের বাসযোগ্য করে তুলতে হয়, জলবায়ু দূষণের জন্যে দায়ী স্বৈরতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের আঁতাতের বিরুদ্ধে সর্বস্তরে প্রতিরোধ জারি রাখতে হবে।

৪. নৈসর্গিক ভারসাম্য রক্ষার সঙ্গে সমতা ও সামঞ্জস্যবোধ সম্পন্ন নতুন পৃথিবী নির্মাণের নিগূঢ় সম্পর্ক উপলব্ধি নিসর্গনৈতিক নারীচেতনাবাদের পক্ষে আবশ্যিক। (তপোধীর, ২০২৪, পৃপৃ. ২০–২১)

শহীদুল জহিরের ছোটগল্পে স্বল্প পরিসরে কিন্তু জোরালো উপস্থিতি নিয়ে নারী ও প্রকৃতি দুটি উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। জোরালো এই অর্থে যে, জহিরের গল্পে নারী ও প্রকৃতির রূপায়ণ একেবারে অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিবাদী ও পুরুষনির্ভর সমাজকাঠামোতে নারী ও প্রকৃতিকে 'আদার' বা 'অপর' হিসেবে বিবেচনার যে কাঠামো, সে কাঠামোকে জহির বিনির্মাণ

করেন। পুরুষতন্ত্রের অনুশাসনকে ভেঙে দিয়ে বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় নারী ও প্রকৃতি সত্তার এক নতুন নির্মিতি গড়ে তোলেন; যে নির্মিতিতে নারী ও প্রকৃতি সত্তার নবরূপায়ণ সাধিত হয় এবং নারী ও প্রকৃতি হয়ে ওঠে গল্পের মূল বা কেন্দ্র। গল্পগুলিতে জহির নারীর নিজস্ব স্বর তুলে ধরেন এবং প্রকৃতিকে মানবিকী করে উপস্থাপন করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে পরিবেশ নারীবাদ বা ইকোফেমিনিজমের আলোকে জহিরের প্রাসঙ্গিক গল্পগুলি পাঠের সমূহ সম্ভাবনা তৈরি হয়।

নারী ও প্রকৃতি: প্রান্তিকায়িত সত্তা

পরিবেশ নারীবাদের একটি মৌল ভিত্তি হলো প্রকৃতি ও নারীকে একইভাবে নিয়ন্ত্রণ ও শোষণের কৌশল পুরুষতন্ত্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ পুরুষকে সবল, সাহসী, যুক্তিবাদী হিসেবে এবং অমানবীয় প্রকৃতি ও নারীকে অসহায়, ভীরু, দুর্বল হিসেবে প্রতিপন্ন করে। এর ফলে উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করাটাও পুরুষের জন্য সহজ হয়। পুরুষের নিয়ন্ত্রাধীনে নারী ও প্রকৃতি হয়ে ওঠে প্রান্তিক ও অধস্তন। পুঁজিবাদ ও পুরুষতন্ত্রের দাপটে নারীর প্রান্তিক সত্তার স্বরূপ উন্মোচিত হয় জহিরের 'এই সময়' গল্পে। এ-গল্পে মহল্লার মাস্তানদের জোর-জবরদস্তি, নারীলিপ্সু পুরুষসমাজের উৎপীড়ন, রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত আইন ও প্রশাসনব্যবস্থার ছত্রছায়ায় সমাজের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণির প্রতিনিধি আবু, হাবু ও শফির উত্থান এবং সাধারণ মানুষের জীবনের ছন্দপতনের বিষয়গুলি নির্দেশ করেন গল্পকার। লেখক দেখাতে চান, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী নানাভাবে যৌন হয়রানির ও নিপীড়নের শিকার হয়। আবদুল আজিজের মেয়ে রূপবতী শিরীন আকতার বাইশ বছর বয়সে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসার পর মহল্লার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকেরা তার বাড়িতে ভিড় করে। এলাকার মাস্তান আবু, হাবু ও শফির আসা-যাওয়া বেড়ে যায়। মাওলানা জব্বারের দেওয়া 'বেহেশতের জেওর' নামক বই ও জামদানি শাড়ি; ক্ষমতাধর এরশাদ সাহেবের দেওয়া 'এক সেট গয়না' ও আবু, হাবু ও শফি তিন ভাইয়ের দেয়া 'কাচের সুদৃশ্য বোতলে আধগ্যালন মেশক-এ-আম্বর আতর' প্রভৃতি উপঢৌকন শিরীন আকতারের জন্য পাঠানো হয়। এই শ্রেণির লোলুপতার বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন মাস্তান আবু শিরীনকে বিয়ে করবে বলে মেজর ইলিয়াসকে সাবধান করে এবং 'মেজর ইলিয়াস তখন হাসে এবং বলে, ঠিক আছে, অল্প একটু শেয়ার দেও!' (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ১০৮)। পুরুষের আধিপত্যপ্রবণ মানসিকতায় নারীকে এমন সহজলভ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। মোহাব্বত আলীর সাথে গড়ে-ওঠা শিরীনের সহজাত প্রেমময় সম্পর্কও এলাকার মাস্তান, মৌলবাদী, সামরিক-শাসকদের মতো অধিপতিশীল পুরুষদের পেষণে ভয়ংকর পরিণাম পায়। নিম্নোক্ত বক্তব্যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

> সে রাতে কিছুক্ষণ পর ছোট ভাই শফি যখন কাজি সাহেবকে নিয়ে আসে এবং বিয়ের দোয়া পড়ার পর কাজি সাহেব যখন শিরীন আকতারের সামনে বসে বলে যে, ইমারত

> হোসেনের পুত্র আবু হোসেনের সঙ্গে সে তার বিয়ের প্রস্তাব কবুল করে কি না, তখন সেখানে উপস্থিত সকলে স্পষ্ট এবং উঁচু করে উচ্চারিত শিরীন আকতারের 'না' শুনতে পায়। তিনবার শিরীন আকতার 'না' বলে এবং তিনবারই ঘরের লোকেরা বলে ওঠে, কবুল করছে এবং তারপর বলে, বিয়া হয়া গেল, অখন আমরা যাই (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ১১২)।

শিরীনের স্পষ্ট প্রতিবাদ ও অসম্মতি সত্ত্বেও ক্ষমতার অপকৌশল প্রয়োগ করে শিরীনের সাথে মিথ্যা বিবাহ সম্পন্ন করে মহল্লার মাস্তান আবু। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে নারীর প্রান্তিক হয়ে ওঠা এবং ক্ষমতাশীল শ্রেণির মূল্যবোধ-অবক্ষয়জনিত কেন্দ্রের মস্তিষ্ক থেকে প্রান্তবাসীর অপরত্ব নির্মাণ করা হয়। এই অপরীকরণের উৎস হলো ক্ষমতার আধিপত্য বা হেজিমনি।

প্রান্তীয় নারী শ্রেণির ওপর আধিপত্যের আরেক রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে জহিরের 'আমাদের বকুল' গল্পে। আলোচ্য গল্পে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যপ্রবণ মানসিকতার দরুন পরিবার ও সমাজে নারীর অস্তিত্বহীনতার বৃত্তান্ত রচনা করেন গল্পকার। গল্পটির শিরোনামে 'বকুল' নামের এক নারীর কথা উঠে এলেও গল্পের প্রায় পুরোটা জুড়ে রয়েছে বকুলের মা ফাতেমা। ফাতেমার হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পটভূমিতে গল্পটি রচিত। সুহাসিনী গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক আকালু শ্যাকের স্ত্রী ফাতেমা। বিয়ের সময় আকালু এক নারীসহ যৌতুক হিসেবে ধূসর রঙের একটি গরুর বাছুর পায়। গল্পটিতে নানাভাবে নারী ও গরু সমার্থক হয়ে ওঠে। এই সমার্থকতা ব্যক্ত হয় কখনও 'সবল ও অপরিমিত যৌবনবতী' নারীর শরীরের গঠনের সাথে কিংবা সন্তান উৎপাদনের সাদৃশ্যে। লেখকের বর্ণনায়:

> একদিন আইজ্জল প্রামাণিকের দেয়া বকনাটা গরম হয়; ফাতেমা সেদিন সন্ধ্যায় রাস্তা থেকে গরু আনতে গিয়ে ব্যাপারটা খেয়াল করে। পরদিন আকালু গ্রামপাঙ্গাসি নিয়ে গিয়ে ফাতেমার এই কাজলা গাইকে পাল দেখিয়ে আনে এবং এর কিছুদিন পর আকালু ফাতেমার গর্ভবতী হওয়ার খবর পায়। এই দুই যুবতী প্রাণীর একসঙ্গে গর্ভধারণের ঘটনায় আকালু হয়তো অবাক হয় না, অথবা হয়তো হয়; কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পর যখন উভয়েই যমজ বাচ্চা প্রসব করে তখন আকালুর শুধু একার নয়, সুহাসিনীর সকল লোকের বিস্ময় হয়; তারা আকালুকে বলে, ক্যারে, তর হশুরতো দেখি তক ভালই ম্যায়া দিছে, দুইজনে একই রকম দেইখতে, আবার দুই জনেই একসঙ্গে দুইখান ক্রা বাচ্চা দেয় (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ২০২)।

এখানে উদ্ধৃতাংশে ফাতেমা ও কাজলা গরুর মধ্যে অদ্ভুত সাজুয্য দৃষ্ট হয়। এই সাজুয্যের উপস্থাপনে লেখক মূলত আমাদের সমাজ মানসের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেন। পুরুষতান্ত্রিক

সমাজে 'নারী' ও 'পশু' একইরকম প্রতীকী কাজটি করে থাকে। পুরুষের শোষণে শোষিত ও দমনমূলক 'অপর' হিসেবে তারা টিকে থাকে। আমাদের সমাজমানসে প্রকৃতিকে নারী এবং নারীকে প্রকৃতিকরণের বিষয়টি প্রচল রয়েছে। প্রকৃতিকে নারীকরণ করতে গিয়ে তাকে বলা হয় মাদার ন্যাচার। আর নারীকে প্রকৃতিকরণ করে নিয়মিতভাবে ছদ্মবেশী পশুর ভাষায় বর্ণনা করা হয়। ভাষা ও চিহ্নের মাধ্যমে এই প্রকৃতিকরণ করা হয়:

> Language that depicts women, animals, and nonhuman nature as inferior to (having less status, value, or prestige than) men and male-identified culture. Women routinely are described in pejorative animal terms : Women are dogs, cats, catty, pussycats, pussies, pets, bunnies, dumb bunnies, cows, sows, foxes, chicks, bitches, beavers, old bats, old hens, old crows, queen bees,… elephants and whales (warren, 2000, p. 27).

উল্লেখ্য, এই প্রকৃতিকরণের অন্তরালে থাকে একটি বিশেষ লক্ষ্য যা 'পিতৃতন্ত্রের দ্বারা নিপীড়নের একটি উপায় হিসেবে গড়ে ওঠে' (Gruen, 1993, p. 61)। এ সম্পর্কে লরি গ্রুয়েন বলেন:

> The role of women and animals in postindustrial society is to serve/be served up; women and animals are the used. Whether created as ideological icons to justify and preserve the superiority of men or captured as servants to provide for and comfort, the connection women and animals share is present in both theory and practice (Gruen, 1993, p. 61).

সামন্তবাদে কিংবা পুঁজিবাদে পুরুষতন্ত্র নারী ও প্রকৃতিকে অধস্তন বা আদার হিসাবে গণ্য করে নিজেদের ক্ষমতাশীল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। আলোচ্য গল্পে জহির নারী ও গরুকে অভিন্ন রূপে বার বার উচ্চারণের মাধ্যমে যে বিবরণ প্রদান করেন, সেখানে লেখকের ভাষা কঠোর সমালোচনার ভাষা এবং জহিরের নারীর অধঃপতিত দশা-সম্পর্কিত জহিরের উচ্চারণ তাঁর নারীবাদী চেতনার পরিচায়ক। গ্রামীণ নারী এবং অবলা প্রাণীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বলেই অবলা প্রাণীর মতো ফাতেমাকেও নীরবে সহ্য করতে হয় স্বামীর ভর্ৎসনা, তিরস্কার, 'বাঞ্জা মেয়ে'র অপবাদ, মাদ্রাসার তালেবুল এলেম রফিকুল ইসলামের সাথে জড়িয়ে কুৎসা-কথা ইত্যাদি। নারী গরুর মতো অবলা প্রাণী বলেই যেকোনো সময় চুরি হয়ে যায় বা তার কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। ফাতেমার হঠাৎ নিখোঁজ হওয়া বা হারিয়ে যাওয়ায় গ্রামবাসী সন্দেহ করে যে আকালু তাকে মেরে ফেলল কি-না বা বিক্রি করে দিল কি-না কিংবা সে গ্রামের মাদ্রাসার

শিক্ষক রফিকুল ইসলামের সাথে পালিয়ে গেল কি-না? এরকম দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে নারী নিপীড়নের চিত্র যেমন উঠে আসে আবার নারীর প্রতি পুরুষের সন্দেহপ্রবণতারও পরিচয় মেলে। প্রাচীন সমাজব্যবস্থায়ও নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ ছিল। চর্যাপদের কবি কাহ্ন পা-কে (১০ সংখ্যক চর্যা গান) সন্দেহবশত প্রশ্ন করতে দেখা যায়– "হালো ডোম্বী তো পূছমি সদভাবে। আইসসি জাসি ডোম্বি কাহেরি নাবেঁ॥" (Shahidullah, 1966, p. 30) আধুনিককালে এসে নারীর প্রতি পুরুষের সন্দেহপ্রবণ মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয়নি। পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি যেমনই হোক না কেন মা হিসেবে সন্তানের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা ভিন্ন। আলোচ্য গল্পে মোহসিন মৌলবির পরামর্শে ফাতেমার দুই সন্তান বকুল ও আমির বিচিকলা গাছ লাগায় যা জীবিত ফাতেমার প্রতীক হয়ে ওঠে; যেটিকে আঁকড়ে ধরে বকুল ও আমিনা সান্ত্বনা পায় যে, তাদের মা বেঁচে আছে। একরাতে ঘোরের মধ্যে বকুল কলা গাছের কাছে গিয়ে কলা গাছের গোড়া জড়িয়ে ধরে "মা মা, বলে কাঁদে; তখন বিচিকলা ঝোপের ভেতর লাল পিঁপড়া প্রতীক্ষায় ছিল, তারা তাদের ঢিপি ছেড়ে উঠে আসে। ... সুহাসিনীর লাল পিঁপড়া বকুলকে খেয়ে যায়" (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ২০৯)। এখানে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হাতে বকুলের সম্ভ্রমহানি ও তার মৃত্যুময় করুণ পরিণতি নির্দেশিত হয়েছে। গল্পটিতে ফাতেমার নিরুদ্দেশের আসল কারণ জানা যায় না। তবে গল্পের শেষে বকুলের পরিণতি হয়তোবা নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ফাতেমার পরিণতিকেও নির্দেশ করে। পুরুষের ক্ষমতার বলয়ে নারীর অস্তিত্ব এভাবেই বিলীন হয়ে যায়– এই বার্তা জহির তাঁর পাঠকের কাছে পৌঁছে দেন।

ব্যক্তি ও সমাজের যে সকল অনুষঙ্গে নিপীড়ন বা কর্তৃত্বের ধারণা যুক্ত থাকে সেসকল অনুষঙ্গের একটি হচ্ছে যৌনতা। অ্যান্ডি স্মিথ যেমনটি বলেন– 'sexism is the most pressing form of oppression' (Smith, 2014 , p. 22) পৃথিবীর সবদেশেই সমাজ ও পরিবারে নারী কেবল যৌন-আনন্দের উপকরণ হিসেবে বিবেচ্য হয়েছে। এক্ষেত্রেও পুরুষ নিজেকে সক্রিয় ও নারীকে নিষ্ক্রিয় হিসেবে গণ্য করে। বিশেষ বিশেষ পৃথক শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নারী-পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। এই বৈশিষ্ট্যকে উপজীব্য করে সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য তৈরি হয়। এই বৈষম্যে নারী পুরুষের তুলনায় দুর্বল বলে বিবেচিত হয়। নারী-পুরুষের শারীরিক পার্থক্যকে উপজীব্য করে যৌনক্ষেত্রেও পুরুষ নিজেকে বলশালী, সক্রিয় বলে মনে করে এবং নারীর শরীরকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে। এর ফলে ধর্ষণ যৌনতার রাজনীতির (sexual politics) একটি প্রধান দিক। ধর্ষণের মধ্য দিয়ে নারীর ওপর এক ধরনের বিকৃত আক্রমণের সক্ষমতা প্রদর্শন করা হয়। নারী-পুরুষের এই জৈবিক পার্থক্যকে উপজীব্য করে সামাজিক বিভাজন তৈরি হয়, পুরুষ-নারীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় উঁচু-নিচু (হায়ারার্কি) ধারণা। নারী পুরুষের কাছে অপর বা আদার হিসেবে বিবেচ্য হয়। অথচ যে নারী তার ভিন্নধর্মী জৈবিক সত্তার কারণে সন্তান জন্মদান করে, সে নারী নিঃসন্দেহে পুরুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে পুরুষ। আর পুরুষের নিয়ন্ত্রণে নারী হয়েছে অধস্তন।

পুঁজিবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোতে নারীর মতো প্রকৃতিকেও দুর্বল ও অসহায় হিসেবে গণ্য করে নির্বিচারে প্রকৃতি নিধন করা হয়। আর প্রকৃতি বিনষ্টির মূল ভূমিকায় থাকে পুরুষ। পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্রের হাত ধরে যন্ত্রসভ্যতার ক্রমবিকাশ প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে শুরু করে। শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ধারণায় বন কেটে বসতি স্থাপন ও গ্রামকে নগরে পরিণত করে শিল্প কারখানা স্থাপন করে পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্র। প্রকৃতির প্রতি পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই আগ্রাসনকে পরিবেশ নারীবাদীরা নারী-নিপীড়নের সাথে এক করে দেখেন। পরিবেশ-নারীবাদীদের মতে, প্রকৃতি হচ্ছে নারীবাদী বিষয়। "গাছ, জল, প্রাণী, বিষাক্ত পদার্থ এবং প্রকৃতির ভাষা হলো নারীবাদী বিষয়। কারণ এগুলি অনুধাবনের বিষয়টি একজনকে আন্তঃসাংস্কৃতিকভাবে নারীর অবস্থা ও দুর্দশা বুঝতে সাহায্য করে" (Warren, 2014, p. 04)। শহীদুল জহিরের গল্পে প্রকৃতির প্রতি আগ্রাসনের বিষয়টি নানাভাবে উঠে আসে। পুঁজিবাদী সমাজের ছোঁয়ায় প্রকৃতির ক্ষয় ও পতন এবং শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতার নানা প্রান্ত উন্মোচন করেন জহির। নগরকেন্দ্রিক মানুষ কৃত্রিম ভোগবিলাসে লিপ্ত হয়ে যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। প্রকৃতি হয় দূষণময়। আর পরিবেশ ও প্রকৃতির দূষণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের অস্তিত্বের সংকট প্রকটরূপ ধারণ করে। 'চতুর্থ মাত্রা' গল্পে প্রকৃতি-বিপর্যয়ের এক ছবি চিত্রিত হয় এভাবে:

আগন্তুক : কী দেখেন?

আ.ক : ধলেশ্বরী নদী দেখি।

আগন্তুক : নদী তো নাই, শুকায়া গেছে গা।

আ.ক. : শুকনা নদীই দেখি।

আগন্তুক : শুকনা নদী তো নাই এখন তো একটা ধানক্ষেত।

আ.ক : ধানক্ষেতই দেখি।

আগন্তুক : ধানক্ষেত তো নাই। ধান তো খরায় মইরা গেছে।

আ.ক. : তা হইলে মরা ধানক্ষেতই দেখি।

... ...

আগন্তুক : মরা নদী তো নাই, এটা তো এখন ধানক্ষেত। ধানও তো নাই, খরায় পুইড়া গেছে। আছে কেবল ফাটা জমি! (শহীদুল, ২০১৩, পৃপৃ. ১৬২–১৬৩)।

লেখক সরাসরি না বললেও পাঠকের বুঝতে সমস্যা হয় না, নগরায়ণ ও যন্ত্রশিল্পের অবাধ অগ্রগতিই প্রকৃতি বিপর্যয়ের কারণ। প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণেই "নদী শুকিয়েছে, মরে গেছে। বেড়েছে কেমিক্যাল সার কারখানা। মদের ভাটি, পার্টি অফিস। ভারত-বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র রাজনৈতিক পেশিশক্তিসমৃদ্ধ জমির দালাল, প্রোমোটার, সন্ত্রাসীদের দাপট গ্রামে জল নাই।... বিশ্বায়নের প্রচণ্ড আক্রমণে অসহায়, ছিন্ন হতে থাকে আমাদের জীবন" (কিন্নর, ২০১৩, পৃ. ৮৬৯)। 'এই সময়' গল্পে বিষয়টি আরও স্পষ্ট। গল্পে দেখা যায়, হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরির বার্নারে গোলযোগের কারণে "চোঙার ভেতর দিয়ে নির্গত কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বায়ুপ্রবাহ এই ধোঁয়া ফ্যাক্টরির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের মহল্লার উপর দিয়ে ছড়িয়ে দেয়। ভূতের গলির ওপর আসতে আসতে ধোঁয়ার রং হালকা হয়ে আসে, গন্ধও থাকে না, কিন্তু বাতাসে এর ক্রমাগত উপস্থিতির কারণে ভূতের গলির লোকদের নাকে হালকা প্রদাহ জিইয়ে থাকে" (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ১০৪)। এই বাতাস থেকে সৃষ্ট হাঁচি রোগ ভূতের গলির লোকেদের জীবনে এক জটিলতা তৈরি করে। হাঁচির রোগে আক্রান্ত হয় সুতাকলের মালিক এরশাদ সাহেব, শরীয়ত পার্টির সদস্য মওলানা আবদুল জব্বার, গাউসিয়া ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিক মরহুম ইয়াসিন ব্যাপারীর বিধবা স্ত্রী মালেকা বানু এবং মেজর (অব.) ইলিয়াছ খান প্রমুখ ক্ষমতাধর, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। প্রভাবশালী শ্রেণিস্বার্থে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণের কবলে প্রভাবশালীরাই পড়ছে– এমন দৃশ্য রচনায় লেখকের প্রতিবাদের দিকটি স্পষ্ট হয়। এবং এদের আদেশে মহল্লার মাস্তান, 'লাল ইটের বাসা'য় বসবাসরত, চাক্কু ও বন্দুকধারী আবু, হাবি ও শফি হাঁচির নিরাময়ে মহল্লার সেলিমের জীবনের একমাত্র শুশ্রূষা 'ফুলের বাগান' দুই ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিনাশ করে দেয়। অথচ ফুল গাছের সাথে মোহাম্মদ সেলিমের সম্পৃক্ততার পেছনে একটি সংবেদনশীল কারণ জড়িত। গল্পের সূচনাতেই জানা যায়, সেলিমের জন্মকালেই তার পিতা-মাতা পৃথিবী থেকে গত হন। নবজাতকের মুখ থেকে মৃত মায়ের স্তন সরিয়ে নেয়ার পর "জননীর শেষ উষ্ণতা একটা ফোয়ারার মতো তার মুখমণ্ডল সিক্ত করে এবং সে জেগে উঠতে গিয়ে পুনরায় সেই উষ্ণ সুবাসের ভেতর ঘুমিয়ে থাকে" (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ১০০)। এই সুবাস সেলিমের নির্জ্জন মনে এমনভাবে গেঁথে থাকে যে, এর পর থেকে তার দুধের গন্ধ ভালো লাগে। এই দুধের ঘ্রাণ নেবার জন্য গাঁদা ফুল সংগ্রহ করে। গল্পাংশে বর্ণিত হয়েছে এভাবে:

> ... তার দাদি যখন পুনরায় মৃত হাজেরার কথা বলে, তখন পুনরায় সে বলে যে, দুধের ঘ্রাণ তার ভালো লাগে, এবং তখন অনেক খুঁজে সে মহল্লা থেকে দুটো গাঁদা ফুল সংগ্রহ করে এবং অনেক দিন পর শরিফা বেগমকে সঙ্গে করে আজিমপুর কবরস্থানে যায়। এরপর সে বাবা-মায়ের কবরে ফুল দেওয়ার জন্য তাদের বাসার প্রাঙ্গণ বিভিন্ন ফুল গাছে ভরে তোলে। তখন মহল্লার লোকেরা একসময় দেখে যে, মহল্লায় মৌমাছি এবং ভ্রমরের আনাগোনা বেড়ে যায় এবং মহল্লার কতিপয় লোক বিভিন্ন সময় মৌমাছির আক্রমণের শিকার হয়; মহল্লার লোকেরা বিষয়টি নিয়ে যখন

> চিন্তিত হয়ে ওঠে তখন মহল্লায় বৃষ্টি নামে এবং বৃষ্টির পর লোকদের ক্রমাগত হাঁচি হতে থাকে এবং চোখ দিয়ে পানি গড়ায় (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ১০১)।

এখানে দুধের গন্ধের স্বাদ নেবার প্রসঙ্গ এবং মৃত মা-বাবার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা এক সংবেদনশীল সম্পর্কের নির্দেশ করে। আর এক্ষেত্রে ফুল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অথচ মানুষ কিছু না জেনে-বুঝে কেবল ক্ষমতা বা প্রতাপের কারণে প্রকৃতিতে নিষ্ঠুরভাবে প্রভুত্ব বিস্তার করে, যার একটি দিক প্রকাশিত হয়েছে গল্পের মধ্যে। হাঁচি প্রতিরোধের জন্য ফুল গাছ কর্তন করা হয়; আধুনিক মানুষ যেমন করে ভেবেছে যে, প্রকৃতির অধীনতা থেকে নিষ্কৃতি পেলে কিংবা প্রকৃতিকে শোষণ করতে পারলে মানুষের মুক্তি সম্ভব।

শহীদুল জহির প্রত্যক্ষ করেন, পুঁজিবাদ ও পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের আগ্রাসন নারী-প্রেম-প্রকৃতির অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়। 'এই সময়' গল্পে দেখা যায়, মানুষের প্রভুসত্তার কারণে নির্বিচারে গাছের নিধনযজ্ঞ চলে। অথচ মানুষের হাঁচি রোগের মূলে ছিল ফ্যাক্টরির বার্নারে গোলযোগ। ফলে এক মাস পর বাতাস পড়ে এলে এই হাঁচির প্রাদুর্ভাবও থাকে না। বিষয়টি সকলেই অবগত হওয়ার পর মোহাম্মদ সেলিম পুনরায় ফুলের চারা রোপণ করে। প্রকৃতি-অনুরাগী মোহাম্মদ সেলিমের সৌন্দর্যজগৎকে অনুভব করতে পেরে মহল্লার বিধবা শিরীন আকতার সেলিমের সাথে একটি স্বাভাবিক প্রেমময় সম্পর্ক গড়ে তোলে। সেলিমের দেয়া গোলাপ ফুল শিরীন ভালোবাসার সাথে গ্রহণ করে। অন্যদিকে নারীলিপ্সু এরশাদ সাহেবের দেয়া এক সেট গয়না, মওলানার দেয়া বেহেশতের জেওর নামের বইটা, জামদানি শাড়ি ইত্যাদি শিরিন গ্রহণ না করে স্বাভাবিকভাবেই অন্যকে দান করে দেয়। সমাজের উচ্চবর্গের পুরুষদের লোলপুতার দিকটি বুঝতে সক্ষম বলেই সেলিমের দেয়া ফুল-পাতা শিরিনের মনে ভালোবাসার জন্ম দেয়। কেবল 'গোছা হলুদ কলাবতী' ফুলই নয়; তাদের পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের বাহন হয় গাছের পাতা। লেখকের বর্ণনায়:

> তখন মোহাম্মদ সেলিম বলে, আপনি করমচা গাছ দেখছেন?
>
> ... ...
>
> না দেখিনিকা।
>
> হড়বরই গাছ দেখছেন?
>
> না।
>
> হড়বরই গাছের পাতা দেখছেন?
>
> না।

কামরাঙা গাছ দেখছেন?

না।

পাতা দেখছেন?

না।

তারপর মোহাম্মদ সেলিম বিভিন্ন গাছের পাতা হাতে করে শিরিন আকতারের দরজায় এসে টোকা দিতে থাকে... (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ১০৭)।

এখানে প্রকৃতির অনুষঙ্গে সেলিম ও শিরীনের পারস্পরিক ভাব-বিনিময় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং এই ভাব-বিনিময় তাদের জীবনে ভয়াবহ পরিণাম বয়ে আনে। সেলিম ও শিরীনের অন্তরঙ্গতার পরিচয় পেয়েও ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে শিরীনের সাথে মহল্লার মাস্তান আবু মিথ্যা বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে। অন্যদিকে শিরীন আকতারের বাড়ির সামনে লাইটপোস্টে ঝুলে থাকে মোহাম্মদ সেলিমের লাশ। ক্ষমতার এই অপপ্রয়োগ একটি অবক্ষয়িত সমাজের রূপকে প্রকট করে। সেই সাথে সেলিমকে হত্যার পর শিরীন আকতারের বাড়ির সামনে লাইটপোস্টে ঝুলিয়ে রাখা লাশ ওই সমাজের মানুষের প্রতি সতর্কবাণী ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য মোহাম্মদ সেলিমের বুড়ি দাদি তিন ভাইকে অভিসম্পাত দিলেও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী অনুসন্ধান করতে এলে এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ তিন ভাইকে ভালো ছেলে বলে প্রশংসা করে। দারোগার জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে মহল্লাবাসীর নির্লিপ্ততা উক্ত মাস্তানদের ইন্ধন দেয়। ফুল ও নর-নারীর প্রেম সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতার প্রতীক। সেই সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা কীভাবে ক্ষমতাধরদের হাতে বিনষ্ট হচ্ছে তারই একটি প্রান্ত উন্মোচিত হয় 'এই সময়' গল্পে।

সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা বিনষ্টির আরেক রূপ চিত্রায়িত হয় 'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' গল্পে। পুঁজিবাদের আগ্রাসন কীভাবে আমাদের প্রকৃত সত্তার বিনষ্টি ঘটায়, উন্নয়নের নামে কীভাবে আমাদের ঐতিহ্য ও নিজস্বতা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে তার এক অনন্যসাধারণ উপস্থাপনা আলোচ্য গল্পটি। এ গল্পে তরমুজের কাহিনির মধ্যে একটি অবক্ষয়িত সময় বা শিল্পায়নের ইতিহাসকে যুক্ত করে দেন গল্পকার। 'তরমুজ' নিয়ে এর আগে লিখিত হয় শওকত ওসমানের উপন্যাস *পতঙ্গ পিঞ্জর*। ঔপন্যাসিক 'পোকায় ঘিরে রাখে তরমুজ'-এর রূপকে পাকিস্তানি আধা-ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাঙালি জাতির অবক্ষয়ের মধ্যে পতিত হওয়ার দৃশ্যটি ধারণ করেন। অন্যদিকে জহির একই মোটিফ নিয়ে 'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' গল্পে নব্য-ঔপনিবেশিক ও শিল্পায়িত সময়ের সংকটকে উন্মোচন করেন। গল্পের সূচনাতেই দেখা যায়, তরমুজ নির্বাচনের এক সংকট দেখা দেয় দক্ষিণ মৈশুন্দি এলাকায়। সংকটটি এরূপ:

> তরমুজের ভেজাল হতে পারে, সাদা তরমুজের ভেতর লাল রং এবং চিনির পানি ইঞ্জেকশন করে ঢোকানো হয়, ফলে তরমুজ লাল এবং মিষ্টি, এই কথা শুনে আমরা বিস্মিত এবং একই সঙ্গে ক্ষুব্ধ হই, আমাদের মনে হয় যে, মানুষের জীবনে কি কোনো মূল্যবোধই অবশিষ্ট থাকবে না (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ২৮৪)।

এখানে দক্ষিণ মৈশুন্দির মহল্লাবাসীর তরমুজ নির্বাচনের এই সংকট পুঁজিবাদের অবক্ষয়িত রূপকে তুলে ধরে। তরমুজ একটি প্রাকৃতিক খাদ্য। কিন্তু দেখা যায়, তা ভেজাল, কৃত্রিম রং ও চিনির দ্রবণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিকৃত হয়ে উঠছে। অর্থাৎ, প্রকৃতি এখানে আর নিখাদ প্রকৃতি নয়– পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হচ্ছে। এরই প্রতিতুলনায় জহির দেখান, "আমাদের পিতারা সুখী ছিল, কারণ তাদের জীবন সরল ছিল, তাদের সম্মুখে দুই রকমের তরমুজ থেকে একটি বেছে নেয়ার সংকট ছিল না" (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ২৮০)। পূর্বপুরুষরা যে ভেজালবিহীন তরমুজ খেতেন, তা এখন মানুষের লোভ, মুনাফা আর প্রতারণার প্রতীক হয়ে উঠেছে। পরিবেশ-নারীবাদ এই পরিবর্তনকে কেবল পরিবেশগত সমস্যা নয়, বরং একটি নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের অবক্ষয় হিসেবে দেখে। পুঁজিবাদ তার আধিপত্য ধরে রাখতে আর্থ-কাঠামোয় আরও কিছু পরিবর্তন আনে। যার একটি কারখানায় তরমুজের প্রক্রিয়াজাতকরণ। সারা বছর ভোক্তার নিকট তরমুজ পৌঁছে দেবার জন্য বা তরমুজ কৌটাজাত করার জন্য হাজি আবদুর রশিদের নির্দেশে লেবেঞ্চুশ কারখানার মতো করে দক্ষিণ মৈশুন্দিতে 'হাজি ফুড প্রডাক্ট কোম্পানি' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' গল্পে আরও প্রত্যক্ষীভূত হয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির চক্রের ভেতর কীভাবে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। লেখক এর কারণ ব্যাখ্যা করেন এভাবে:

> ট্রাক ধর্মঘট হচ্ছে, কারণ ট্রাকের টায়ার, টিউব এবং খুচরা যন্ত্রাংশের দাম বেড়ে গেছে; ... যন্ত্রাংশের মূল্যবৃদ্ধির দুটো কারণ জানতে পারি; এক, যারা স্থানীয়ভাবে এই যন্ত্রাংশ তৈরি করে তারা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের দাম তিন গুণ বাড়িয়েছে, এবং দুই, মোটরগাড়ির যন্ত্রাংশের আমদানির উপর যে শুল্ক ধার্য ছিল, তা বিশ শতাংশ বাড়িয়ে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ করা হয়েছে; ... লেদ মেশিনের কাঁচামালের দাম বেড়ে গেছে, কর বসানো হয়েছে, তা ছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম, যেমন: চাল, ডাল, তরমুজের দাম বেড়েছে, কাজেই তারা কী করতে পারে; ... আমরা তরমুজের দাম কমানোর কোনো পথ খুঁজে পাই না, ত্রিশ টাকা থেকে নেমে তা পঁচিশ টাকায় স্থায়ী হয়, ফলে আমাদের তৈরি বিস্কুট, লজেন্স, নাট-বল্টুর দাম বাড়ে (শহীদুল, ২০১৩, পৃপৃ. ২৯০–২৯১)।

লেখক দেখান, উৎপাদিত দ্রব্যের সঙ্গে যুক্ত মালিক শ্রেণি এবং দ্রব্যের ওপর ধার্যকৃত কর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ। এভাবে তরমুজকে ঘিরে যে সংকট (ভেজাল, কারখানায় প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্যানজাতকরণ)– তা দেখায় কীভাবে উৎপাদনব্যবস্থা শিল্পায়িত বাজার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে এবং বাজারকেন্দ্রিক উৎপাদনের ফলে প্রকৃতি ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের জায়গাটি বদলে যাচ্ছে। শিল্পায়নের ফলে কেবল প্রাকৃতিক উপাদানের ক্ষতিসাধন হয় না, মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক আচরণে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সমাজের পুরো কাঠামোটি শিল্পের আক্রমণে ধস্ত হয়। সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে মূল্যবোধের ধারণা কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, মানবীয় গুণাবলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে, সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কগুলোকেও কীভাবে প্রভাবিত করছে সেসব নির্দেশ করেন গল্পকার। শিল্পায়নের সাথে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে যায় জমি দখলের মাধ্যমে শোষণের বিষয়টি যা আসলে একধরনের পিতৃতান্ত্রিক– আগ্রাসী চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। হাজি আবদুর রশিদ লেদ মেশিনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে মহল্লার নিঃসন্তান, বৃদ্ধা রহিমা বিবির দেড় কাঠার বাড়ি দখলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এখানে বৃদ্ধা নারী রহিমা বিবি হয়ে উঠেন প্রকৃতির প্রতীক– অসুরক্ষিত, অবহেলিত এবং দখলের উপযোগী। অর্থাৎ, নারী-প্রকৃতি উভয়কেই একসঙ্গে ভোগ্যপণ্য ও উৎপাদসাধনের বস্তু হিসেবে কল্পনা করা হচ্ছে। একইভাবেই বৃহৎ পুঁজিশক্তি প্রকৃতি ও কৃষিকে উৎপাদনমুখী যন্ত্রে রূপান্তরিত করে। শিল্পায়নের ফলে গ্রামীণ কৃষিখাতে পরিবর্তন আনয়নের ফলে চিরতরে ধ্বংস হচ্ছে গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প; যা কৃষককে পরনির্ভরশীল করে ফেলছে। গল্পাংশে তারই একটি রূপ বর্ণিত হয়েছে এভাবে:

> এবার আমরা সারা বছর তরমুজ পাব, আমাদের কৃষক ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে বসে থাকতে হবে না; ... আমরা জানতে পারি যে, তরমুজ কাটা, বাছাই ও পরিষ্কার করা, তারপর জীবাণুমুক্ত অবস্থায় কৌটাজাত করার ব্যবস্থা হবে ফ্যাক্টরিতে এবং এখানে আমাদের মহল্লার ১৫–২০ জন কাজ পাবে (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ২৯৪)।

এখানে তরমুজ ফ্যাক্টরির উদাহরণে দেখা যায়– প্রকৃতির স্বাভাবিক উৎপাদন-চক্রকে অস্বীকার করে শিল্প-প্রযুক্তি ‘সারা বছর তরমুজ’ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এই প্রতিশ্রুতি মানুষকে প্রলুব্ধ করছে এবং প্রকৃতিকে তাঁর জীবন্তগতি ও প্রজননশীলতা থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। এই বিষয়টিকে জেন বাউডিলার্ড (১৯২৯–২০০৭)-এর সিমুলাকরা বা সিমুলেশন (Simulacra and Simulation) ধারণার সাথে মেলানো যায়। বাউডিলার্ড (Baudrillard, 1983)-এর মতে, আমরা কোনো কিছুর প্রকৃত রূপ পাচ্ছি না। যেমন: তরমুজ থেকে তরমুজের জুস হচ্ছে, সেই জুস কৌটাজাত করে বিক্রি করা হয়। তিনি তার সিমুলেশন সংক্রান্ত বক্তব্যের দ্বিতীয় পর্যায়ে এই ধরনের প্রক্রিয়াকে বলেছেন বাস্তবের বিকৃত রূপ (Perversion of reality)। অন্যদিকে পরিবেশ নারীবাদী তাত্ত্বিক বন্দনা শিবা এই ধরনের উদ্যোগ কিংবা উন্নয়নকে

'Maldevelopment' বা 'অপউন্নয়ন' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন[৪]। যেখানে কৃষককে পরনির্ভরশীল করা হয়, গ্রামীণ ঐতিহ্য ও কুটিরশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের পরিবর্তে শিল্পকারখানার কৃত্রিম জগতে বন্দি হয়ে পড়ে। ফলে পরিবেশ নারীবাদী পঠে স্পষ্ট হয়, শিল্পায়নের নামে যে উন্নয়ন ঘটছে, তা আসলে নারী, প্রকৃতি ও কৃষকের বিরুদ্ধে একই আগ্রাসী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। এর ভেতর দিয়ে মানবিক গুণাবলি, সামাজিক সম্পর্ক এবং ন্যায়ভিত্তিক সহাবস্থানের চর্চাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে।

অন্ত্যজ নারী: কণ্ঠস্বরের পুনরুদ্ধার

পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা নির্মিত নারীত্বের সংজ্ঞায়নে কখনই নারীর বুদ্ধিদীপ্ত, সাহসী ও স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতি মেলে না। নারীকে সর্বদাই ভীরু, আবেগী, দুর্বল বলে প্রতিপন্ন করে পুরুষ নিজের কর্তৃত্ব ও আধিপত্যকেই বজায় রাখে। আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মানসিকতায় অভিযোজিত নারীও সব সময় 'মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার' শিখানো বুলিতে প্রতিবাদ করার ভাষা অর্জন করতে পারে না। পরিবেশ নারীবাদ নারীর অবমাননার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। নারী-পুরুষের মধ্যকার বিভাজন বা বৈষম্য ঘুচিয়ে নারীর একক স্বরকে প্রতিষ্ঠা করে। শহীদুল জহির তাঁর ছোটগল্পে এই প্রান্তের নারীকে গল্পের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত করেন। এই অভীষ্ট লক্ষ্যে গল্পে প্রান্তিকায়িত নারীস্বরের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তাঁর গল্পের নারীরা প্রতিবাদী, লড়াকু। সমাজ-নির্ধারিত ধারণা কিংবা পুরুষতান্ত্রিক প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে নারীরা নিজের মুক্তির পথ খুঁজে নেয়। নিঃসন্দেহে লেখকের এই প্রয়াস পরিবেশ নারীবাদী ভাবনার সাথে সংহতি রক্ষা করে।

'আমাদের বকুল' গল্পের আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায়, যৌনতার কারণেই নারীকে দেখার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে পুরুষতন্ত্র। পুরুষ যৌন-আনন্দ উপভোগের জন্য নারীর শরীরকে মোহনীয়, আকর্ষণীয় করে রাখার নানান বিধান দেয়, ফর্সা নারী মানেই 'সুন্দর' এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে সমাজে বর্ণবাদের ধারণাকে প্রকট করে তোলে। সুতরাং বর্ণবাদ কিংবা পুরুষতন্ত্র একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। এ প্রসঙ্গে নারীবাদী দার্শনিক লরি গ্রুয়েনের মন্তব্যটি প্রাসঙ্গিক:

> The structures of patriarchy heteronormativity and racism and colonialism and speciesism are not simply similar or metaphorically connected, but rather, work together (not always or simultaneously) to solidify the power the dominant class gains through the construction of a subordinated "other". Though some get confused by identity politics in debates about these

> intersections, these are **structures or system** of power (Gruen, 2014, p. 129).

নারীকে ফর্সা ও মোহনীয় করে উপস্থাপন একইসঙ্গে পুঁজিবাদী পিতৃতন্ত্রের ধারণা। পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্র তার মুনাফাকে নিশ্চিত করতে নারীকে বাজার অর্থনীতির ধারণায় প্রতিষ্ঠিত করে। বিষয়টি সুস্পষ্ট করে মুন্সী মহম্মদ ইউনুস ভারতীয় বিজ্ঞাপন থেকে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বলেন:

> কোনো বিজ্ঞাপন বলছে, কোন্ সাবান ব্যবহার করলে গোলাপের পাপড়ির মতো ফরসা হওয়া যাবে, আর কোন্ ক্রিম এক সপ্তাহের মধ্যে দুধে-আলতায় রঙে রাঙিয়ে দেবে, আবার কোন গাড়ি চড়লে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত মহিলা পাশের সিটে বসবে আর কোন্ সেভিং ক্রিমে নারীর হাতের পেলব পরশ পাওয়া যাবে। ... এই সমস্ত বিজ্ঞাপনই আদি ও অকৃত্রিম পুরুষের চোখেই নির্মিত যেখানে নারী তার প্রাপ্ত ছদ্মস্বাধীনতায় নিজেকে পুঁজির মধ্যে ন্যস্ত করে আর এই পুরো প্রক্রিয়ায় সমস্ত মুনাফাটাই গিয়ে ওঠে পুঁজিবাদের হাতে। এখানেই খুঁজে নিতে হয় না 'ক্ষমতার সম্পর্ক' তথা রাজনীতিকে। যেখানে নারীকে ব্যবহারের প্রকৌশলে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র 'প্রান্তিক' করে তোলে, করে তোলে 'ওরা' (ইউনুস, ২০১২, পৃ. ৪১৬) ।

এভাবে বিশ্বপুঁজিতন্ত্রের পণ্যসর্বস্বতা সর্বত্র নারীদের ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে বিচ্ছিন্ন করে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠায় অন্তরায় ঘটায়। পাশাপাশি পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্র পুরুষ ও নারীর মধ্যকার শ্রেণি বৈষম্যের সাথে সাথে 'ফর্সা নারী' ও 'কালো নারী'র ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে সমাজে বিভাজনের ভেদরেখাকে প্রকট করে তোলে। ফর্সা মানে সুন্দর এবং কালো মানে অসুন্দর, নিকৃষ্ট ইত্যাদি ধারণার প্রতিষ্ঠায় সমাজ-অভ্যন্তরে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রয়োগ দেখা যায়; ব্যক্তির আচরণে নিজ ও অপরের বৈষম্য চিহ্নিত হয়। শহীদুল জহিরের 'মাটি এবং মানুষের রং' এমনই একটি গল্প, যেখানে রয়েছে শ্রেণিগত, বর্ণগত বৈষম্য। এই বৈষম্যকে উপজীব্য করে এক শ্রেণির ক্ষমতা প্রদর্শন এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে নারীর তীক্ষ্ণ, তীব্র প্রতিবাদ। গল্পটি গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত। গ্রামীণ জীবনপটে কালো-ফর্সা রঙের পার্থক্য কিংবা বর্ণবৈষম্যের যে ধারণা প্রচলিত সেখানে কালো বর্ণের নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করার বিষয়টি দেখাতে চান জহির। সেই সাথে একটি প্রতিবাদের দৃশ্য চিত্রায়ণের ফলে "একটা অধঃপতিত-নিরীহ জাতিসত্তার সমূলে দাঁড়ানোর চমৎকার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এখানে" (কামরুজ্জামান, ২০১৯, পৃ. ১৬)। জহির গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি সহমর্মী। তাঁর দৃষ্টিতে মাটি ও মানুষের রং এক। মাটির সাথে সম্পৃক্ত যে মানুষ তার গায়ের রং মাটির রঙের মতো। গ্রামীণ খেটে খাওয়া মানুষ যদি ফর্সাও হয় একটা সময় রোদে পুড়ে ক্ষেতে কাজ করতে করতে তার গায়ের রং বাদামি থেকে কালো

হতে থাকে। কিন্তু দবির খাঁর স্ত্রী আসিয়া খাতুন না জেনে কালো ও ফর্সার মধ্যে তফাৎ করে। ফর্সা নাতি কামনায় মালেকের সাথে ফর্সা রঙের মেয়ে ময়নার বিয়ে দেয়। দবির খাঁর ঘরে পুত্রবধূ হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন থাকলেও আম্বিয়ার গায়ের রং কালো হওয়ার কারণে ওই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় না। অর্থনৈতিক ক্ষমতাকাঠামোয় নিম্নবর্গের আম্বিয়ার সাধ পূর্ণ হয় না উচ্চবর্গীয় দবির খাঁর ঘরের পুত্রবধূ হবার। আম্বিয়ার বিয়ে হয় "খেটে খাওয়া, মুনীষগিরি করে! বদলা বেইচ্চা খায়!" (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ৪৪) এমন মানুষ জোবেদের সাথে। কেবল গায়ের রং নয়, সেই সাথে রয়েছে অবস্থানগত বৈষম্য। আফতাব খাঁ, দবির খাঁ– খাঁ বংশের হওয়ার কারণে জলুস ভোগ করেছে। শ্রেণিগত অবস্থানে আম্বিয়ার পিতা নইমুল্লাহ তাদের মতো সম্মানের অধিকারী নয়। এ-কারণে আসিয়া খাতুন নিজেকে নিয়ে কেবল গর্ব করে না, নইমুল্লাহ থেকে এগিয়ে থাকার কারণে আম্বিয়াকে তাচ্ছিল্য করে কথা বলে। ফর্সা হওয়ার কারণে পুত্রবধূ হিসেবে ময়নাকে ঘরে আনলেও আসিয়া খাতুনের মনোবাঞ্ছা অবশ্য সিদ্ধ হয়নি। ময়নার সন্তান ফজুর গায়ের রং কালো। অন্যদিকে আম্বিয়ার ছেলের রং হয় ফর্সা। ঈর্ষায় কাতর আসিয়া খাতুন কিছু আকাঙ্ক্ষা পূরণের অভাবে বিরূপ মন্তব্য করে, "ছিনালগো পোলা সুন্দরই অয়" (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ৪৬)। এর উত্তরে আম্বিয়া তার চিরায়ত মসৃণ স্বভাব-রূপ বজায় রেখে শুকনো এবং নিচু গলায় যা বলে তা নিম্নবর্গের করুণ বাস্তবতাকেই প্রকাশ করে। আম্বিয়ার ভাষ্যে:

> দেকবাইন চাচি, রোইদে কেমুন ক্ষেত জ্বইলা জ্বইলা কালা অয়। খেতের উপরে মানুষ জ্বলে কালা কয়লার লান। সারা শরীর খালি, শুধু কুমেরে কাছা দেওন লুঙ্গি। ... আমার সোয়ামির কুমোরের লুঙ্গি খুইল্লা দিলে বুজার পারবেন অমনেরও এইরম পোলা অইতে পারে। আমার ছিনাল হওন লাগে নাই সুন্দর পোলার লাইগ্‌গা (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ৪৭)।

এখানে লক্ষণীয়, দবির খাঁ-এর মতো গ্রামীণ উচ্চ শ্রেণির মানুষদের কাছে ফর্সা নারীর গ্রহণযোগ্যতা তুলনামূলকভাবে বেশি বলে দরিদ্র ও একইসঙ্গে কালো রং-এর নারীদের হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। যদিও আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারীর গ্রহণযোগ্যতা শেষপর্যন্ত কালো ও ফর্সা রং-এর ওপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে পুরুষের দয়ার ওপর। মধ্যযুগের কবি আলাওল তাঁর কালের বাস্তবতায় সেই চরম সত্য কথাটি প্রকাশ করেন *পদ্মাবতী* কাব্যে– "সুরূপে কুরূপে কেহ না গোয়ায় কাল/যারে স্বামী দয়া করে সেই নারী ভাল" (আলাওল, ২০১৩, পৃ. ৭৭)। আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারী মাত্রেই পুরুষের অধস্তন। কেবল ফর্সা ও কালো রং-এর বৈপরীত্য প্রতিষ্ঠা করে অধস্তন নারীকে আরও অধস্তন করতে, কোণঠাসা করতে সুবিধা হয় পুরুষের। শহীদুল জহির এই মনোভাবের বিপরীত বিন্দুতে অবস্থান করে দেখাতে চান, খেটে খাওয়া মানুষের সাদা চামড়া বেশিদিন সাদা থাকে না। এখানে আম্বিয়ার বক্তব্যে ইঙ্গিতবাহী তীক্ষ্ণ সমাজ-বাস্তবতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একইসঙ্গে নারীর নীরবতার সংস্কৃতি ভাঙার প্রয়াসও

লক্ষযোগ্য। পুরুষতন্ত্র নারীকে অবদমিত করে রাখার মধ্য দিয়ে তাকে নীরব করে রাখে, তার স্বরকে উচ্চকিত বা বলিষ্ঠ হতে দেয় না। জহিরের আম্বিয়া চরিত্রটি তার স্বরকে উচ্চকিত করে প্রমাণ করে, নারী কেবল পিতৃতান্ত্রিকতার বলি, তা নয়। আসিয়া খাতুনের অপমানের জোর প্রতিবাদস্বরূপ আম্বিয়া আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। সেই সাথে সমাজের উচ্চবর্গীয় শোষক নারী শ্রেণি তাদের চেয়ে নিচু শ্রেণির নারীদের শোষণেও ভূমিকা রাখে। এ-বিষয়ে সমালোচক যেমন বলেন:

> অপরীকরণে তারাই সক্রিয় পক্ষ যাদের হাতে নির্ণায়ক ক্ষমতা থাকে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যাঁরা প্রান্তিক মানুষ, তাঁরাও নিজেদের মধ্যে এই আচরণে লিপ্ত হন, ক্ষমতার ছিটেফোঁটা ভাগ পাবার আশায় (জাহিরুল, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, পৃ. ৩০)।

পুরুষতন্ত্রকে চেতন-অবচেতনে ধারণ করে পুরুষের সাথে নারীরাও নারীর প্রতি নির্মম হয়ে ওঠে। আলোচ্য গল্পে এক নারী কর্তৃক আরেক নারীকে ভীষণ নিন্দনীয়ভাবে আক্রমণ করা হয়। এরই বিপরীতে এক নিম্নশ্রেণি নারী আম্বিয়ার প্রতিবাদ। সেই সঙ্গে কালো শরীরের প্রতিই তার সুতীব্র আকর্ষণের কথা জানা যায়। নিম্নশ্রেণির নারীর মুখে এমন জোরালো বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে জহির নারীর স্বতন্ত্র স্বরকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'Can the Subaltern speak? ' (Spivak, 1994) গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের এই জিজ্ঞাসার উত্তর যেন শহীদুল জহিরের গল্পে খুঁজে পাওয়া যায়। পুরুষশাসিত সমাজে নারী অবরুদ্ধ-বাকরুদ্ধ। তার নিজস্ব কণ্ঠস্বরটিও পুরুষের দাপট কাছে ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে নিম্নবর্গের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা কখনও পূর্ণ হবার নয়; এই বাস্তবতাকে সত্য জেনেই শহীদুল জহির নিম্নবর্গের মধ্য দিয়ে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রতিবাদী মনোভাবের সামান্য প্রকাশটুকু দেখান। সেটাকে কখনও অতিরঞ্জিত রূপ দেন না। সেই সঙ্গে আলোচ্য গল্পে আম্বিয়ার প্রতিবাদ নিঃসন্দেহে ইকোফেমিনিস্ট চেতনার বহিঃপ্রকাশ, যেখানে নারী নিজের শরীরকে অপমানের পরিবর্তে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে।

নিম্নবর্গীয় নারীশ্রেণিকে কেন্দ্রে রেখে রচিত শহীদুল জহিরের আরও একটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'ডলু নদীর হাওয়া'। এ গল্পে জহির একদিকে দেখান পুরুষ কর্তৃক নারীর অধস্তনতা, অন্যদিকে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে পুরুষের উপরে নারীর অবস্থান। গল্পের কেন্দ্রীয় দুটি চরিত্র আহম্মদ তৈমুর আলী চৌধুরী ও তার স্ত্রী সমর্ত বানু। গল্পে সমর্ত বানুর চরিত্রটি ইকোফেমিনিস্ট পাঠে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। "একটা মগের মুখ্য মেয়ে কেমন করে গ্রামের সবচাইতে সমর্থ ও উপযুক্ত পুরুষটাকে ধরে" (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ২৭৪) সেটাই এ গল্পের আলোচ্য বিষয়। সমর্ত বানু মগ মেয়ে। তার আসল নাম এলাচিং। আরাকানের জঙ্গলের মতো সবুজ, গভীর ও রহস্যময় সমর্ত বানু। তৈমুর সাহেবগোছের মানুষ, ক্ষমতাশীল, যার ক্ষমতা ও দাপটের কাছে

সমর্তবানুর যাপিতজীবন অবরুদ্ধ হয়ে যায়। কেবল সমর্ত বানুর ক্ষেত্রেই নয়, তৈমুরের জন্য সাতকানিয়ার অনতি-যুবতী মেয়েদের জীবনে নেমে আসে নানা সংকট। আকিয়াব, রেঙ্গুন-মান্দালয় হয়ে সে যখন সাতকানিয়ায় চলে আসে তখন দেখে এলাকার মেয়ে "হুসনেআরা-মনোয়ারা-রশেনারারা গোপনে কান্দে, তাদের মায়েরা মাথায় তুলে দেয়া নোংড়া এবং ন্যাতার মতো শাড়ির আঁচল কামড়ে ধরে চেহারা মলিন বানিয়ে রাখে" (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ২৬৬)। বিপন্ন এসকল নারীরা তৈমুরের হাত থেকে নিস্তার পায় না। মায়েরা তৈমুরের পিতা মওলা বকশের নিকট গিয়েও বিচার পায় না। একমাত্র সমর্তের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে তৈমুর আলীর দাপটের জবাব দেবার। তৈমুরের মা গোলেনুরের কাছে এই নারী এক বিস্ময়। সমর্তকে কাছে পেতে তৈমুর সমর্তের প্রেমিক সুরত জামালকে চাকরি দিয়ে আলিকদম পাঠায়। এবং তার পিতা জসিম করাতিকে লোহাগড়ায় কাঠের ব্যবসায়ীর কাছে রেখে এসে সমর্তকে যখন জানায় "আজিয়া রাতিয়া আইস্সম" (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ২৭০) তখন তৈমুরের শক্তিমত্তা লক্ষ করেও সমর্ত পিছপা হয় না। পুরুষের ক্ষমতার দাপটকে রুখতে সমর্ত কৌশলের আশ্রয় নেয়। প্রথম শর্ত হিসাবে বাঁশের কঞ্চি ও বরইয়ের কাঁটার বেড়া দেয় তার বাড়ির আঙিনায়। আর তৈমুর আলীকে জানায়:

> খুঁজে দেখলে ভিটায় প্রবেশ করার তিনটি পথ পাওয়া যাবে, এই তিনটা পথের একটায় গর্ত করে খরগোশ ধরার ফান্দ পাতা আছে, তৈমুর আলিকে এই ফাঁদ এড়িয়ে প্রবেশ করতে হবে; সে যদি তা না পারে, যদি সে ফান্দের গর্তের ভেতরে পড়ে যায়, তাহলে সে ফিরে যাবে এবং আর কোনো দিন এমুখো হবে না (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ২৭০)।

নিজেকে রক্ষা করবার জন্য এটা সমর্তর বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল। সমর্তের শর্ত অনুযায়ী, গৃহে প্রবেশের পথ খুঁজতে গিয়ে তৈমুর গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। শর্ত মোতাবেক সে ফিরে না গিয়ে সমর্তের কুঁড়েঘরে প্রবেশ করে। শেষ পর্যন্ত সমর্ত নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। সমর্ত বানুর সাথে জোরপূর্বক রাত কাটিয়ে নিজের জৈবিক ক্ষুধা নিবারণ করে তৈমুর আলী চৌধুরী। তবে যে দম্ভ ও সাহস নিয়ে তৈমুর পা বাড়িয়েছিল, সমর্ত-র তৈরি ফাঁদে পড়ে সে পা ভেঙে যায়, তৈমুর পঙ্গু হয়ে যায়। এলাচিং বা সমর্ত চাইলে পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু অত্যন্ত সাহসী নির্ভীক নারী সমর্ত পালিয়ে বাঁচতে চায়নি। বরং চেয়েছিল তৈমুরের পাশে থেকে তার উপর প্রতিশোধ নিতে। তবে নারী যতই ক্ষমতা প্রদর্শন করুক না কেন পুরুষের পেশী শক্তির কাছে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। তৈমুরের পেশী শক্তির কাছে পরাজিত হয় সমর্ত। আবার বিয়ের রাতেও দেখা যায়, "সমর্ত বানু বিড়াল মারলেও তখন তৈমুর আলির চেহারা দেখলে মনে হতো যে, সেটা সেই মেরেছে, রাগে তার চোখমুখ থেকে ভাপ বের হতে থাকে এবং সেদিন উত্তেজনা ও ক্রোধের এই সম্মিলিত দানবীয় প্রকাশের সামনে সমর্ত বাত্যাপীড়িত তৃণের মতো দলিত হয়" (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ২৬৫)। এখানে তৈমুর আলি চৌধুরীর শারীরিক দম্ভ ও

সহিংসতা এখানে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের প্রতীক, যা নারীকে অধস্তন সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করে। আগেই বলা হয়েছে, পিতৃতন্ত্র গড়ে উঠেছে নারী-পুরুষের দৈহিক শক্তির পার্থক্যকে কেন্দ্র করে। দৈহিক দিক থেকে পুরুষ নিজেকে বলশালী বিবেচনা করে নারীকে লাঞ্ছিত করে, অসম্মান করে, নির্যাতন করে। এই স্বায়ত্তীকরণ প্রক্রিয়াটিকে কেউ কেউ আবার উপনিবেশায়নের সাথে তুলনা করেন (Mies, 1986, p. 09)। শহীদুল জহির নারীর এই উপনিবেশিত হবার বাস্তবতাকে সত্য মেনে আলোচ্য গল্পে দেখান তৈমুরের দৈহিক সক্ষমতার কাছে সমর্ত পরাস্ত হয়। সেইসঙ্গে সমর্তের বুদ্ধিজাত কৌশলের কাছে তৈমুরের হেরে যাওয়া নিঃসন্দেহে উল্লিখিত বয়ানকে পাল্টে নারীর উত্তরণ ঘটায়। সমর্ত বানু রক্ষা না পেলেও তার প্রথম চুক্তির পর "তৈমুর আলি চৌধুরীর খঞ্জত্বের শুরু" হয় (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ২৭২), তার পা খোঁড়া হয়ে যায় এবং 'দ্বিতীয় চুক্তি করে লম্বা রেশমের অদৃশ্য সুতার আগায় ঝুলন্ত মাকড়সার মতো সারা জীবন লটকে থাকে এবং শেষে এর আগামাথা না বের করতে পেরে মরে' (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ২৭৪)। এভাবে তৈমুরের ক্ষমতার দম্ভকে পরাস্ত করতে সমর্ত বানু বিয়ের আগে একটি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তৈমুরকে পরাস্ত করে। এবং বিয়ের পর আরেকটি চুক্তির প্রস্তাব করে। তৈমুরকে জানায়– তার মা অঙমেচিংর দেয়া হীরার আংটি ডুবিয়ে তৈরি বিষে তাকে মারা হবে। আহম্মদ তৈমুর আলী চৌধুরীও সমর্ত বানুর এই খেলার সাথি হয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়। গল্পে লক্ষণীয়, সমর্ত বানু তার স্বামীকে খাওয়ার সময় দুটি পানি ভরা কাঁচের গ্লাস সামনে রাখে, যার একটিতে থাকে জ'অর বা বিষ। সমর্তের এই দ্বৈততার মধ্যে প্রকৃতির দ্বিমুখী রূপ ফুটে ওঠে। পানি এখানে জীবনদায়ী ও বিষ বিনাশী শক্তির প্রতীক। নারী ও প্রকৃতির মধ্যে এই দ্বৈত রূপ আছে; পালন করে, আবার প্রয়োজনে ধ্বংস করে। সমর্ত তার গৃহে দুই গ্লাসে বিষ ও পানি দেওয়ার নামে এমন একটি ম্যাজিক সৃষ্টি করে যার সাহায্যে পুরুষের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। বিয়ের চল্লিশ বছর পর উভয় গ্লাসের পানি পানে তৈমুরের মৃত্যু হয় এবং সমর্তের মুক্তি ঘটে।

সুরত জামালের জন্য সমর্তের প্রেম ও প্রেমে অবদমনের কারণে তৈমুরের প্রতি সমর্ত কেবল ঘৃণা প্রদর্শন করে। ক্ষমতাধর পুরুষের কারণে একদিকে সে তার ভালোবাসা হারায়, অন্যদিকে সম্ভ্রম। তারই প্রতিবাদ দেখা যায় সমর্তের মধ্যে। সমর্তের বিষ প্রয়োগে স্বামীর মৃত্যুর প্রসঙ্গ নজরুলের 'নারী' (সাম্যবাদী) কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়– 'এতদিন শুধু বিলালে অমৃত, আজ প্রয়োজন যবে/ যে হাতে পিয়ালে অমৃত, সে হাতে কূট বিষ দিতে হবে' (কাজী নজরুল, ২০১৮, পৃ. ৯১)। অর্থাৎ, নারী কেবল অমৃতদাত্রী, প্রেমময়ী বা স্নেহশীলা নয়, প্রয়োজনে সে প্রতিহিংসার আগুন হয়ে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'কূট বিষ' দিতেও সক্ষম। সমর্ত বানুর বিষ প্রয়োগ আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ হলেও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে এটি একটি জোরালো প্রতিবাদ। ভার্জিনিয়া মরিস তাঁর 'Double Jeopardy : Women Who kill in Victorian Fiction' গ্রন্থে ভিক্টোরীয় যুগের উপন্যাসে খুনি নারীদের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার সূত্রে দেখানোর চেষ্টা করেছেন অপরাধের মধ্য দিয়ে কীভাবে তারা ওই সমাজের

বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। যদিও নারীর এই অপরাধমূলক কার্যকারণের কোনো ব্যাখ্যা অপরাধবিজ্ঞানীরা করেননি। তাদের কাছে এটাকে কেবল পাগলামি কিংবা উদ্ভটত্ব বলে মনে হয়েছে। নারীর এই খুন বা অপরাধ ছিল মূলত "নিজের জীবনের হাজার দুর্ভোগের চূড়ান্ত একটা প্রতিবাদ। ... নারী যে যুক্তিসংগতভাবে, স্বাধীন চিন্তায়, নিজের দায়িত্বে 'খুন' করতে পারে, অপরাধবিজ্ঞানীর লিঙ্গকেন্দ্রিক মস্তিষ্ক তা ভাবতে পারে না" (সালাহউদ্দীন, ১৯৯৬, পৃ. ১৪৯)। ভিক্টোরীয় যুগে লেখকদের এই কথা সরাসরি বলতে পারাটাও এক ধরনের অপরাধ ও দুষ্কর্ম বটে। শহীদুল জহির যে কালে এই ধরনের লেখা লিখছেন সে কালটা ভিক্টোরীয় যুগের নারীদের কালের মতো দুর্গম ছিল না। তবে পুরুষ হয়ে এক নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ অবশ্যই বিশেষত্বের দাবি রাখে। পরিবেশ নারীবাদের আলোকে দেখা যায়, নারী ও প্রকৃতি উভয়কেই ভোগ ও শোষণের বস্তুতে রূপান্তর করা হয়। কিন্তু তারা অন্তর্নিহিত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে। আলোচ্য গল্পে সমর্ত বানু তার প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে চল্লিশ বছরের অবদমিত ভালোবাসার পূরণে আলিকদম যায় প্রেমাস্পদের কাছে। এই অভিগমনের মধ্য দিয়ে প্রান্তিকতার সীমানা পেরিয়ে সমর্ত বানু পৌঁছে যায় তার আপন ঠিকানায়, যা পিতৃতন্ত্র-প্রকৃতিনাশী শক্তির বিরুদ্ধে পরিবেশ-নারীবাদী প্রতিরোধকে চিহ্নিত করে।

অমানবীয় প্রকৃতি: মানবীয় সত্তারূপে উত্তরণ

পশ্চিমা পুঁজিবাদী সমাজ প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে একে জড় পদার্থ হিসেবে জ্ঞান করে। যেই মুহূর্ত থেকে প্রকৃতি সম্পর্কে এমন ধারণা সৃষ্টি হয় তখন থেকে প্রকৃতি অরক্ষিত হয়ে যায়। প্রকৃতিকে সংরক্ষণের চেষ্টা থাকে না। বরং প্রকৃতির বিনাশসাধিত হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে সর্বদাই প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রকৃতিকে যদি প্রাণসত্তা হিসেবে ধরা হয় তখন তার সংরক্ষণের বিষয়টি এসে যায়। Starhawk-এর ভাষ্যে:

> When we start to understand that the Earth is alive, she calls us to act to preserve her life. when we understand that everything is interconnected, we are called to a politics and set of actions that come from compassion, from the ability to literally feel with all living beings on the Earth. That feeling is the ground upon which we can build community and come together and take action and find direction (1990, p. 74).

প্রকৃতিকে জড় পদার্থ হিসেবে বিবেচনা না করে, প্রকৃতিকে মানুষের পরিপূরক আরেকটি প্রাণসত্তারূপে জ্ঞান করে এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার আত্মিক সম্পর্ককে প্রতিস্থাপন করলে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে কোনো কর্তৃত্বের সম্পর্ক প্রতিস্থাপিত হবে না। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম সাহিত্যিক ও কর্মী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করেন। তাঁর

'বলাই' গল্পে 'আদি প্রাণসত্তার প্রতীক' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬, পৃ. ১৯৪) হিসেবে বৃক্ষ বা গাছকে ব্যাখ্যা করা হয়। আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯–১৯৫৪), জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩–১৯৭৬) নানাভাবে প্রকৃতির নান্দনিক সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন। আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪–১৯৫০) স্বোপার্জিত পরিবেশ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেন; যার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তাঁর বহুলখ্যাত আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার উপন্যাস *আরণ্যক* (১৯৩৯)। এ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি প্রথম আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা বনাম প্রকৃতি ধ্বংস এবং সত্যচরণের যন্ত্রণাকাতর উপলব্ধির প্রকাশ ঘটান। একারণে তাঁকে 'সবুজ আন্দোলনের প্রথম অভিযাত্রী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। রবীন্দ্রধারা ও আধুনিক লেখকদের ধারা থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্রভাবে, জাদুবাস্তববাদের আশ্রয়ে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করেন শহীদুল জহির। জহির তাঁর গল্পে প্রকৃতির ওপর সেই মানবিক গুণ আরোপ করেন এবং আধুনিক নগরচেতনার বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির সাথে মানুষের আত্মলগ্নতার প্রসঙ্গ বারবার উচ্চারণ করেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও যন্ত্রসভ্যতার বিকাশের ফলে নগর জীবন ও পরিবেশে সুযোগ-সুবিধার দরুন মানুষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য ও গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে। ফলে গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতি থেকে ক্রমশ মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে নগরমুখী হয়। গ্রামের সঙ্গে নগর মানুষের এই বিচ্ছিন্নতা ও বিযুক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। এই চেতনার বিরুদ্ধ প্রকাশ শহীদুল জহিরের গল্পে। তিনি তাঁর গল্পে গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেন। এমনই এক গল্প 'কোথায় পাবো তারে' যা গ্রামনির্ভর, প্রকৃতিনির্ভর গল্প। আলোচ্য গল্পে দক্ষিণ মৈশুন্দি কিংবা ভূতের গলির লোকজনের সাথে পাঠক এক জটিলতায় জড়িয়ে পড়লেও গল্পের উপান্তে পরম প্রশান্তি লাভ করে। গল্পে এলাকাবাসীর জটিলতার কেন্দ্রে রয়েছে আবদুল করিম। অর্থাৎ জটিলতা তৈরি হয়েছে আবদুল করিমকে নিয়ে। ভূতের গলির লোকেরা জানতে পেরেছে আবদুল করিম ময়মনসিংহ যাচ্ছে। সে সকলকে জানায়, শেফালি নামে তার এক বন্ধু যার সাথে মহাখালী বাসস্ট্যান্ডে সাক্ষাৎ হয় এবং সাক্ষাতের প্রথম দিনেই সে আবদুল করিমকে ময়মনসিংহে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু গ্রামের লোকেরা আবদুল করিমকে আর যেতে দেখে না। এরই মধ্যে আবদুল করিম ময়মনসিংহ হতে আবদুল আজিজ ব্যাপারীর জন্য ডাল, আলী আকবরের জন্য আখের গুড় এবং বাবুল মিঞার জন্য আলু কিনে আনার প্রতিশ্রুতি দেয়। তারা কেউ আবদুল করিমের উপর ভরসা করতে পারে না। তারা জানে যে, আবদুল করিম ময়মনসিংহ যাবে না এবং সেখানে শেফালি বেগম নামে কেউ নেই। কিন্তু তারা আবদুল করিমের কথার-মারপ্যাচে গোলক ধাঁধার মধ্যে পড়ে যায়। শেষপর্যন্ত সকলের সন্দেহের অবসান ঘটাতে সে আবদুল আজিজ ব্যাপারীর বড় ছেলে দুলাল মিঞাকে নিয়ে ময়মনসিংহ যায়। কিন্তু শেফালির দেয়া ঠিকানা এক অদ্ভুত ধাঁধার মতো। বাসস্ট্যান্ড হতে ফুলবাড়ি যাওয়ার দুই রকমের বাস, আবদুল করিমের জুতার ফিতায় গিট লেগে যাওয়া– ইত্যাদি ঘটনায় আবদুল করিমের ময়মনসিংহ যাওয়া হলেও শেফালির বাড়িতে পৌঁছনো

হয় না। সবার জন্য সস্তা দামে ডাল, আলু, গুড় নিয়ে আসার যে প্রতিশ্রুতি সে দিয়েছিল তাও পালন করতে পারে না। এখানে গল্পে ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় শেফালি বেগমের বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছুতে পথের যে নির্দেশ পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ :

ঢাকা মহাখালী বাসস্ট্যান
মৈমনসিং শহার, গাঙ্গিনার পাড়

গাঙ্গিনার পাড়– আকুয়া হয়া ফুলবাইড়া বাজার, থানার সামনে উল্টা দিকে হাঁটলে বড় এড়াইচ (কড়ইগাছ) সামনে টিএনউ অপিস টিএনউ অপিস সামনে রাইখা খাড়াইলে, বাম দিকের রাস্তা– নাক বরাবর হাই স্কুল ছাড়ায়া বরাবর সুজা, ধানক্ষেত, কাঁটা গাছ, লাল মাটি, বামে মোচড় খায়া নদী

আহাইলা/আখাইলা/আখালিয়া নদী

নদী পর হয়া ব্রিজ পিছন দিয়া খাড়াইলে

দুপুরবেলা যেদিকে ছেওয়া পড়ে তার উল্টা দিকে,

ছেওয়া না থাকলে, যেদিকে হাঁটলে পায়ের তলায় আরাম লাগে সেই দিকে

নদীর পার বরাবর এক মাইল হাঁটলে দুইটা নাইরকল গাছ

দুই নাইরকল গাছের মইদ্দে খাড়ায়া গ্রামের দিকে তাকাইলে

তিনটা টিনের ঘর দেখা যাইব

তিনটা ঘরের একদম বাম দিকের ঘরের পাশ দিয়া যে রাস্তা গেছে

সেই রাস্তা ধইরা

আগাইলে চাইর দিকে ধানক্ষেত, পায়ে হাঁটা আইলের রাস্তা

দূরে চাইর দিকে আরো গ্রাম

ক্ষেতে পাকা ধান যেদিকে কাইত হয়া আছে, সেই দিকে,

অথবা, যুদি ধানের দিন না হয়,

যেদিকে বাতাস বয় সেইদিকে গেলে পাঁচটা বাড়ির ভিটা দেখা যাইব,

তিনটা ভিটা সামনে দুইটা পিছনে,

পিছনের দুইটা বাড়ির ডালিম গাছওয়ালা বাড়ি (শহীদুল, ২০১৩, পৃপৃ. ১৯১-১৯২)।

গল্পের এই বৃহৎ উদ্ধৃতাংশ ও গল্পের নামকরণ 'কোথায় পাব তারে' শিলাইদহের ডাকপিয়ন ও বাউল শিল্পী গগন হরকরার ভগবৎ-ভক্তিমূলক গানের কথা মনে করিয়ে দেয়। গানটি নিম্নরূপ:

আমি কোথায় পাব তারে

আমার মনের মানুষ যে রে!

হারায়ে সেই মানুষে

তার উদ্দেশে

দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে,

লাগি' সেই হৃদয়শশী

সদা প্রাণ হয় উদাসী,

পেলে মন হতো খুশী,

দেখতাম নয়ন ভ'রে (উপেন্দ্রনাথ, বা. ১৪২৬, পৃ. ১০৪৯)।

মনের মানুষ অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে বাউলেরা প্রতিবার 'আত্মানং বিদ্ধি বা 'নিজেকে জানা'-র বিষয়টিকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। তারা আত্মতার মধ্যেই পরমসত্তার সন্ধান করেছে। মানব দেহস্থিত আত্মাই বাউলদের কাছে 'মনের মানুষ, অধর মানুষ, অটল মানুষ, সহজ মানুষ, আলেক মানুষ, অলখ সাঁই, ভাবের মানুষ– মানুষের পরমাত্মা। যদিও এটাই মূলত মানুষের অন্তরতম সত্তা। বাউল মতে, দেহনিরপেক্ষ আত্মার স্থিতি সম্ভব নয়, কাজেই দেহাধারেই আত্মাকে খুঁজতে হবে। আত্মা পরমাত্মার অংশ। আত্মাকে জানলেই পরমাত্মাকে জানা হবে। এই গূঢ় তত্ত্ব না জেনেই আমরা বহির্জগতে পরমসত্তার সন্ধান করি। লালনও একটু ভিন্নভাবে একই ভাব ব্যক্ত করে বলেন– "শুধাইলে তার অন্বেষণ/মূর্খ দেখে কেউ বলে না॥/ হাতের কাছে হয় না খবর/ কি দেখতে যাও দিল্লী লাহোর" (আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ, ২০১৮, পৃ. ২৩৪)। আবার লালনসহ অন্যান্য বাউল শিল্পীদের কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের গানে– "আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিল/ দেখতে আমি পাই নি/ তোমায় দেখতে আমি পাই নি।/ বাহির-পানে চোখ মেলেছি,/আমার হৃদয়-পানে চাই নি" (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬, পৃ. ৪৪)। নিজের দেহে না খুঁজে নানা দেশ ঘুরে ঘুরে তীর্থস্থানে পরমসত্তাকে খোঁজা বৃথা। মক্কা-কাশী না গিয়ে দেহ-কাবা, দেহ-তীর্থে আগে তাকে অন্বেষণ করা উচিত বলে মনে করে বাউলেরা। উপনিবেশবাদের সূত্র ধরে উপনিবেশিতদের মননে চিন্তা ও সংস্কৃতির নানা স্তরে পশ্চিমা আধিপত্যের প্রভাব রয়ে গেছে। বাউল গানে 'আত্মানং বিদ্ধি' বা 'নিজেকে জানা' (know thyself) বিষয়ক ধারণা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পশ্চিমা সংস্কৃতির বদল ঘটানো সম্ভব। বাউল ধর্মসাধনাসহ ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মীয় মতবাদেও এই আত্মানুসন্ধানের কথা বলা হয়। আত্মার

স্বরূপ উপলব্ধির সাধনা বা আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়েই উপনিবেশিতদের স্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম হয়। শহীদুল জহিরের 'কোথায় পাবো তারে' গল্পেও এমন এক অনুসন্ধানের কথা উঠে আসে। আবদুল করিমের ময়মনসিংহ যাওয়ার ঘটনা শুধু ভূতের গলির লোকদের নয়; পাঠককেও গোলক ধাঁধায় ফেলে দেয়। পাঠকও তাকে অবিশ্বাস করতে পারে না। আবার তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। পাঠক জানে, আবদুল করিম শেষ পর্যন্ত কিছুই করবে না। কিন্তু আবদুল করিম যেভাবে প্রকৃতির পটভূমিকায় শেফালির বাড়ির ঠিকানা নির্দেশ করে তা যেন এক নির্মল বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। এখানে এক নারী ও তার ঠিকানা এবং খোঁজার প্রেক্ষাপটটি যেভাবে পাল্টে যায় তাতে পুরো বিষয়টি রূপকের মর্যাদা পায়। নারী ও প্রকৃতির প্রতীকী সমন্বয়ে এক মাতৃপ্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করেন গল্পকার। নারীকে প্রকৃতির মর্যাদা দেয়া কিংবা প্রকৃতিকে নারীর মর্যাদা দেয়ার বিষয়টি নারীনিসর্গবাদীদের লক্ষ্য। সৃষ্টি ও প্রতিপালনের ধারণায় নারী ও প্রকৃতির যোগসাজশ রক্ষিত হয়। আলোচ্য গল্প থেকে পাঠক আবিষ্কার করে বাংলার কোন রূপের কাছে আমরা প্রত্যাবর্তন করব; যেখানে "কত চাল, কত ডাল, কত আখ এবং গুড় হয়, যেখানে কত আলু শিম এবং বেগুন জন্মে এবং এসব জিনিস কত সস্তা দামে ফুলবাড়ীয়া হাটে বিক্রি হয়" (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ১৮৮)। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়ার প্রতীকে এমন একটি দেশের কল্পনা করেন জহির। বাংলার গ্রামীণ রূপ সম্পর্কে জহিরের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ। সেই অভিজ্ঞতার হাত ধরে তিনি আমাদের নিয়ে যান শেফালি ঘোষের বাড়িতে। এভাবে 'কোথায় পাবো তারে' গল্পে পাঠককে নগরজীবন পেরিয়ে গ্রামের শান্ত শীতল পরিবেশে একবার ঘুরিয়ে আনেন জহির। কেন্দ্র-বিচ্যুতির লক্ষ্য নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করান।

খুব স্বল্প পরিসরে হলেও ভীষণ স্পষ্ট ও জোরালোভাবে প্রকৃতি ও মানুষের সম্মিলন জহিরের গল্পের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। 'আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল কেন নেই' গল্পের কথাই ধরা যাক। এখানে গল্পের প্রশ্নাত্মক শিরোনামের উত্তর গল্পের আখ্যানের মধ্যে গেঁথে দেন গল্পকার। লেখক দেখান, যেখানে প্রকৃতির সাথে মানবের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, ফুল-পাখি সেখানে বিরাজ করে; অন্যত্র নয়। নয়নতারা গাঢ় বেগুনি রঙের ফুল। এর সাথে প্রজাপতির সম্পৃক্ততা আছে। নয়নতারা, প্রজাপতি প্রভৃতি প্রকৃতির অংশ। আর প্রকৃতি ও মানবের রয়েছে এক আত্মিক সম্পর্ক। আগারগাঁও কলোনিতে গাছপালা-ফুল-পাখি-প্রজাপতি পরিবেষ্টিত এমন এক আবহ তৈরি হয়েছে শিরীন বানুর হাত ধরে। এর পরের চিত্রটি লেখক বর্ণনা করেন এভাবে:

> কলোনির এই ভবনটির সকল অধিবাসী–বিভিন্ন সরকারি অফিসের কেরানি, ইন্সপেক্টর এবং পাতি কর্মকর্তাদের স্ত্রীরা তাদের বাসার ভেতরটার গাছে পূর্ণ করে ফেলার প্রতিযোগিতায় নেমে যায়। এত করে বাহ্যত প্রকৃতির সঙ্গে আধুনিক মানুষের সম্পর্কের যে ভারসাম্য ছিন্ন হয়েছে বলে জ্ঞানীজনেরা মনে করে, তা এই ভবনটির ভেতর যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি মানুষের সঙ্গে কলোনির এই ভবনের অধিবাসী

> মানুষদের সম্পর্কের যে নৈতিক বিচ্যুতি ঘটে, তাও যেন কতিপয় গুল্মজাতীয় গাছের সবুজ পত্রপল্লবকে ঘিরে মেরামত হয়ে ওঠে। কলোনির এই সকল রমণী এবং তাদের পুরুষেরা জীবনের সৌন্দর্যকে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে শেখে, অর্থহীন এবং বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনের বৃক্ষময় অর্থময়তা খুঁজে নেয় (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ৬৪)।

কলোনি ব্যবস্থায় যেভাবে প্রকৃতিকে নির্মূল করে ইট-পাথরের ভবন নির্মিত হয়, মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক ছিন্ন হয়, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের নৈতিক বিচ্যুতি ঘটে সেসবের বিপরীতে লেখক ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেন। তবে প্রকৃতি ও মানুষের যে আত্মিক বন্ধন তা কেবল প্রাত্যহিক পরিচর্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর জন্য সংবেদনশীলতা জরুরি। জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ব্যক্তি আবদুস সাত্তারের মধ্যে রয়েছে এই সংবেদনশীলতা। একাকিত্বের অন্ধকারে নিমজ্জিত একজন মানুষ আবদুস সাত্তার। আধুনিক নাগরিক মানুষের যন্ত্রণা বহন করে চলে সে। স্ত্রী শিরীন বানুর সাথে তার হৃদ্যতার কোনো সম্পর্ক নেই। শিরিন বানু তার ঘরের বারান্দায় গাছ পরিচর্যার মধ্য দিয়ে কলোনির অন্য সব পরিবারের আদর্শ হয়ে ওঠে। সকলেই তার প্রশংসা করে। কিন্তু শিরিন বানুর সাথে আবদুস সাত্তারের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। এটা আধুনিক নগর-মানুষের জীবনের একটি জটিল দিক।

আলোচ্য গল্পে আবদুস সাত্তারের বাসার বেলকনিতে নয়নতারা ফুলকে কেন্দ্র করে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতির আগমনের কারণ– ফুলের সাথে আবদুস সাত্তারের আত্মিক সম্পর্ক। শহরে হঠাৎ ভূমিকম্প হলে আবদুস সাত্তার দেখতে পায় রেলিংয়ের উপর বাঁধা নয়নতারার ফুলগুলো দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে। ফুলের টব রক্ষা করতে গিয়ে নিজের ভারসাম্য হারিয়ে আবদুস সাত্তার নিচে পড়ে গেলে তার "মাথার খুলি থেঁতলে গলার উপরের প্রান্তে একটি রক্তাক্ত ব্যাঙের ছাতার মত ছড়িয়ে পড়ে, তার মগজ মাটিতে গলে মিশে যায়" (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ৬৯)। আবদুস সাত্তারের এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল আর জন্মায় না, প্রজাপতিও ফিরে আসে না। কলোনির লোকজন নানা প্রয়াস চালালে কোনোভাবেই নয়নতারা গাছ বাঁচিয়ে তোলা যায় না। এমনকি কৃষি কলেজের অধ্যাপক মাটি পরীক্ষা করে চেষ্টা করলেও তিনি অসমর্থ হন। অধ্যাপকের নোটবুক থেকে এটুকু জানা যায়, যে পরিধির মধ্যে আবদুস সাত্তারের মগজ বিস্তৃত হয়েছে কেবল সেই জায়গাটুকুতেই নয়নতারা ফুল গাছ জন্ম লাভ করে। তিনি আরও জানান:

> অন্তত এই কলোনির নয়নতারা গাছগুলোকে একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে সরিয়ে নিলে তারা যে মরে যায়, সে বিষয়ে আমার ধারণা হচ্ছে এই যে, গাছগুলো স্রেফ আত্মহত্যা করে। ... আমি তো জানি, গাছেরা কেমন সংবেদনশীল প্রাণী। আর এ ক্ষেত্রে আত্মহত্যার এই ইচ্ছে প্রথমে এক গাছ থেকে অন্য গাছে ছড়ায় গাছগুলোর নৈকট্যের

> কারণে এবং প্রজাপতি সম্ভবত এই প্রক্রিয়ায় মেসেঞ্জারের কাজ করেছে; পরে আমার সন্দেহ হয়, মাটিরও কোনো এক ধরনের ভূমিকা থাকতে পারে (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ৭০)।

প্রাণসত্তার প্রতীক বলেই গাছের সাথে আবদুস সাত্তারের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং ভূমিকম্পের কবলে পড়ে সেই গাছ রক্ষার প্রচেষ্টায় নিজের জীবন বিপন্ন করে সে। এখানে শহীদুল জহির আবদুস সাত্তার চরিত্রকে প্রকৃতি-বান্ধব করে সৃষ্টি করে আধুনিক মানুষের যান্ত্রিক জীবনের বিপরীতে করে প্রকৃতির সাথে মানবের সংবেদশীল সম্পর্ককে পুনর্বন্ধন করেন।

আধুনিক মানুষ নিজের মধ্যে বহন করে অবিভাজ্য নৈঃসঙ্গিক অনুভূতি। আপন কর্মের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার ফলে শ্রমজীবী মানুষেরা হারিয়ে ফেলছে কর্ম-উদ্দীপনা। আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ মূলত পুঁজিবাদী সভ্যতার সংকট। মানুষের বিচ্ছিন্নতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কার্ল মার্কস পুঁজিবাদী সমাজের ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের ফলে মানুষ শ্রম থেকে, নিজের উৎপাদিত পণ্য থেকে অধিকতর বিচ্ছিন্ন। বিশ্বায়নের নামে পুঁজিবাদী অর্থনীতি সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে 'এক ছাতার তলে' রাখার ব্যবস্থা করলেও মানুষ তার আত্মিক ও মানবিক সব সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের নিজের শ্রমই তার স্ববিরোধী হয়ে ওঠে। পণ্য বা শ্রম থেকে, উৎপাদন প্রণালী থেকে শ্রমিকের ক্রমবিযুক্তি কেবল অর্থনৈতিক বিষয় নয়, এই বিযুক্তি নিজের সাথে নিজের বিরোধের সূচনা করে। সেই সাথে আন্তর্মানবিক সব সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ব্যক্তি। 'fetishism of commodities' এবং 'alienation of labour' বিচ্ছিন্নতার অন্যতম কারণ। পুঁজিবাদ বিকাশের প্রক্রিয়ায় এই বিচ্ছিন্নতা শ্রমিকশ্রেণি ছাড়াও অন্য সকল শ্রেণিতেও সমভাবে ঘনীভূত হয়। এই বিচ্ছিন্নতার অনিবার্য ফল নিঃসঙ্গতা। এই বিচ্ছিন্নতা মানুষের সাথে মানুষের এবং প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে দূরত্ব তৈরি করে। 'আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল কেন নেই' গল্পে আগারগাঁও সরকারি কলোনিতে বসবাসরত কেরানি শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী আবদুস সাত্তারের মধ্য দিয়ে লেখক আধুনিক নাগরিক মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নিঃসঙ্গতার ছবি আঁকেন। সরকারি চাকুরি, সংসার, সন্তান সব পেয়েও যে জীবন তারা যাপন করে তা নিঃসঙ্গ নিস্তরঙ্গ। অফিসের সারাদিনের খাটুনির পর তার বোধে সুন্দর কোনো অনুভূতি ধরা দেয় না। এরই কার্যকারণ হিসেবে আবদুস সাত্তারের মতো নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বাড়ি ফিরে সময় অতিবাহিত করার জন্য তার আশ্রয় হয় ছোট ব্যালকনিতে। স্ত্রী শিরিন বানুর সাথে হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরি হয় না। শিরিন বানু তার ঘরের বারান্দায় গাছ পরিচর্যার মধ্য দিয়ে কলোনির অন্য সব পরিবারের আদর্শ হয়ে ওঠে। সকলেই তার প্রশংসা করে। কিন্তু শিরিন বানুর সাথে আবদুস সাত্তারের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন।

এটা আধুনিক নাগরিক মানুষের সমস্যা। এই গতানুগতিক জীবন থেকে মৃত্যু ভিন্ন আবদুস সাত্তারের গত্যন্তর থাকে না।

প্রবল ভূমিকম্পের মুখে নয়নতারা ফুলের দুটি টবকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভূমিকম্পে আবদুস সাত্তারসহ সকল নয়নতারা গাছের পতনে পাঠক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলের মধ্যে আটকে থাকে। ভূমিকম্পের কিছুদিন পর পুনরায় সতেজ হয়ে-ওঠা ও প্রজাপতি ফিরে এলে শিরিন বানু নিচে পড়ে-থাকা গাছগুলি তুলে এনে বারান্দার টবে নতুন করে রোপণ করে। কিন্তু গাছগুলি সতেজ হওয়ার পরিবর্তে দ্রুত মরে যায়। কলোনির লোকেরা নতুন করে চারা সংগ্রহ ও রোপণের ব্যবস্থা করলেও সেগুলি বাঁচাতে পারে না। কেবল "ভূমিতে, মৃত লোকটির মাথা যে জায়গায় থেঁতলে যায়" (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ৭০) সেখানে লাগানো চারটি চারা বেঁচে থাকে। এজন্য কৃষি কলেজের প্রবীণ অধ্যাপকের মাটি পরীক্ষা করে, মাটিতে মস্তিষ্ক নির্যাসের উপাদান সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড, ফরফরাস ইত্যাদি মিশিয়ে দিয়ে কোনো সুফল পায়নি। গরুর তাজা মস্তিষ্ক এবং মেডিকেল কলেজের মর্গ থেকে মানুষের মগজ এনে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েও কোনো ফল লাভ হয়নি। বাস্তবকে রূপায়ণের ক্ষেত্রে জাদুময়তা তথা নানা অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য ঘটনার সংশ্লেষণ ঘটিয়েছেন জহির।

জাদুবাস্তববাদের আশ্রয়ে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন শহীদুল জহির। কলোনির অবরুদ্ধ জীবন মানুষের জীবনের সকল সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করলেও সংবেদনশীল ব্যক্তিচৈতন্যের সবটুকু মুছে ফেলতে পারে না। যেকোনো বিপন্ন পরিস্থিতিতে মানুষ প্রকৃতির প্রতিরক্ষায় সচেষ্ট থাকে। সেই সাথে বলা যায়, গাছ সংবেদনশীল প্রাণ। যেখানে সংবেদনশীলতার স্পর্শটুকু পায় সেখানেই সে বেড়ে ওঠে, অন্যত্র নয়। শিরিন বানুসহ কলোনির অনেক পরিবারই নয়নতারা গাছের রোপণ ও পরিচর্যা করেছে। কিন্তু প্রকৃতির সাথে মানুষের যে অন্তর্গূঢ় সম্পর্ক তা কেবল প্রাত্যহিক পরিচর্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সংবেদনশীলতা জরুরি। জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ব্যক্তি আবদুস সাত্তারের মধ্যে রয়েছে এই সংবেদনশীলতা।

মানুষ ও প্রকৃতি বহু বিচিত্র উপায়ে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। কেবল নারী নয়, মানুষ মাত্রেই প্রকৃতির অংশ। প্রচলিত ধারণায় সৃষ্টি ও প্রতিপালনের বিষয়টি মূলত নারীর সাথে সম্পৃক্ত হলেও, প্রথাবিরোধী লেখক শহীদুল জহির তাঁর 'ধুলোর দিনে ফেরা' গল্পে পুরুষেরও এই সৃষ্টিশীল ও পরিচর্যাশীল সত্তার পরিচয় তুলে ধরেন। গল্পে সুহাসিনী গ্রামের আবদুল ওয়াহিদের অন্তর্ধান ও একুশ বছর পর তার প্রত্যাবর্তন– এই দুটি বিষয়ের উপস্থাপনায় জহির প্রকৃতির অনুষঙ্গাশ্রয়ী হন। যেমন তিনি বলেন, "ধুলোর গন্ধের ভেতর সে গ্রামে ফিরে আসে", "ফসলের মাঠের ভেতর তার মৃতদেহ পড়ে থাকে" (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ১৩২) ইত্যাদি। ওয়াহিদের জীবন ও মৃত্যুর ঘটনাসমূহের মাধ্যমে গ্রামের মানুষদের স্মৃতিতে অতীতের নকশাল আন্দোলন,

শ্রেণিশত্রুদের সঙ্গে সংঘাত এবং নূরজাহানের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় উদ্ভাসিত হয়। সেই সাথে দুটি ময়না পাখি কেনা ও গোলাপের চারা সংগ্রহ, পাখি দুটিকে কথা বলা শেখানো এবং গোলাপ গাছে ফুল ফোটানো তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। নূরজাহানের কথায় বেঁচে থাকার যে আগ্রহ জেগেছিল, তা যখন বেশি দূর যায় না তখন আবদুল ওয়াহিদ ফুল, পাখি অর্থাৎ প্রকৃতি-সংলগ্ন হতে চায়। পাখি ও গাছের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তার ভেতরের বিষণ্নতা কমে আসে। আবদুল ওয়াহিদের এই বোধদয় হয় যে, পাখিকে কথা শেখাতে যেহেতু এর সাথে কথা বলতে হয়, সেহেতু ফুল গাছে ফুল ফোটাতেও এর সাথে কথা বলতে হয়। গাছের সঙ্গে মানুষের কথা বলার কারণ– "গাছটি চায় সে গাছটির সঙ্গে কথা বলুক।... কোন গাছ যদি বুঝে যায়, মানুষ তার অনুগ্রহের কাঙাল, তখন সেই গাছের কথা না শুনে উপায় কি" (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ১৪৫)। তাছাড়া "গাছের অন্তরসত্তার ভেতর মানুষের কথার শব্দ শোনার স্মৃতির নেশা ছিল" (শহীদুল, ২০১৩, পৃ. ১৪৭)। অর্থাৎ কোনো কিছু হয়ে উঠতে গেলে এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হতে হয় এবং এই সংযোগ পারস্পরিক। কেবল মানুষ নয়, প্রকৃতিও মানবের সংবেদনশীলতা উপলব্ধি করতে পারে। একারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় (বৃক্ষবন্দনা/বনবাণী) বলেন: "অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান/ প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ" (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬, পৃ. ০৭)। সুতরাং প্রকৃতি কেবল অবজেক্ট নয়, বরং মানুষের অনুভূতি, স্মৃতি ও সংবেদনশীলতার প্রতিফলন ঘটায়। গাছ বা অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান মানুষের ভেতরের যন্ত্রণা বোঝে এবং সেই বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে মানুষ শান্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পায়। ফলে মানব ও প্রকৃতির সংলাপ কেবল শব্দের আদানপ্রদান নয়, এটি পারস্পরিক সংবেদনশীলতা এবং জীবনধারার অন্তর্নিহিত সংযোগের প্রকাশ।

পরিশেষে বলা যায়, নারী ও প্রকৃতি উভয়ই আধিপত্যবাদী দমনপ্রবৃত্তির শিকার। ফলে তাদের সংরক্ষণ ও রক্ষার জন্য ন্যায়ভিত্তিক ও সহাবস্থানমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন; যে দৃষ্টিভঙ্গি 'পরিবেশ-নারীবাদী পাঠ' আমাদের অর্জন করায়। ফলে এই পাঠ কেবল সাহিত্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি হয়ে থাকে না, রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি শহীদুল জহিরের গল্পে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়, যেখানে তিনি নারী ও প্রকৃতির ওপর আধিপত্যবাদী নিপীড়ন এবং তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান চিহ্নিত করেন। আর সেই নিপীড়নের প্রেক্ষাপটে জহির পরিবেশবাদী ও নারীবাদী ভাবনা-চিন্তার আলোকে নারী ও প্রকৃতির ওপর নিপীড়নের কারণ অনুসন্ধান করেন এবং নারী ও প্রকৃতির সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও তাঁর গল্পে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। নারী ও প্রকৃতির অনুষঙ্গ আশ্রয়ে আমাদের মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে প্রবলভাবে স্মরণ করিয়ে দেন জহির। নারী ও প্রকৃতির প্রতি মানুষের অবিবেচনা প্রসূত নির্দয় আচরণ, প্রকৃতি বিনাশের কারণ ও পরিণাম, প্রকৃতির প্রতি সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল হওয়া– এইসব বিষয় জহিরের গল্পগুলিকে পরিবেশ নারীবাদ বা ইকোফেমিনিজমের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

অন্ত্য-টীকা

১. নারী কীভাবে প্রকৃতিকে রক্ষা করে তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চিপকো আন্দোলন। ভারতের উত্তরখণ্ডের নারীরা ১৯৭৩ সনে বনউজাড় প্রকল্পের বিরুদ্ধে চিপকো আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। 'চিপকো' হিন্দি শব্দ, যার অর্থ 'আলিঙ্গন' (Hugging) বা 'জড়িয়ে ধরা'। বাণিজ্যিকভাবে গাছকাটা ও বন ধ্বংসের বিষয়ে সরকারী নীতির বিরোধিতা করে নারীরা তাদের বাহু দিয়ে গাছকে জড়িয়ে ধরে প্রতিবাদ জানায়।

২. মানুষ কর্তৃক প্রকৃতি নিয়ন্ত্রাধীনের বিষয়টি বাণিজ্য-পুঁজির দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয় এভাবে:

… men had been ideologically colonized by the short-term commercial values of the market place, trying to take control of nature just as patriarchy tries to control women (Young, 2003, p. 102).

৩. নারী ও প্রকৃতিকে অপর সত্তারূপে জ্ঞান করা কিংবা প্রকৃতিকে নারী ও নারীকে প্রকৃতিরূপে দেখার পেছনে থাকে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব এবং তা দমনপীড়নের উদ্দেশ্যে। এ বিষয়ে নারীবাদী সমালোচকগণ একইরকম মতপোষণ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

… the connection between women and animals … is not to be understood as a ``natural'' connection_one that suggests that women and animals are essentially similar- but rather a constructed connection that has been created by the patriarchy as a means of oppression. (Gruen, 1993, p. 61)

Similarly, language that feminizes nature in a patriarchal culture, where women are viewed as subordinate and inferior, reinforces and authorizes the domination nature. Mother Nature (not Father Nature) is raped, mastered, controlled, conquered, mined. (Warren, 2000, p. 27)

Modern civilization is based on a cosmology and anthropology that structurally dischotomizes reality, and hierarchically opposes the two parts to each other: the one always considered superior, always thriving and progressing at the expense of the other. Thus nature is subordinated to man; woman to man, consumption to production and the local to the global, and so on. (Shiva & Mies, 1993, p. 05)

৪. প্রকৃতি, নারী ও কৃষক সমাজ সম্পর্কে পশ্চিমারা কী ধারণা পরিপোষণ করে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন বন্দনা শিবা:

Nature is unproductive; organic agriculture based on nature's cycles of renewability spells poverty; women and tribal and peasant societies embedded in nature are similarly unproductive, not because it has been demonstrated that in cooperation they produce less goods and services for needs, but because it is assumed that ``production" takes place only when mediated by techonologies for commodity production, even when such technologies destroy life. A stable and clean river is not a productive resource in this view; it needs to be `developed' with dams in order to become so. women, sharing the rive as a commons to satisfy the water needs of their families and society, are not involved in productive labour: When substituted by the engineering man, water management and water use become productive activities. Natural forests remain unproductive till they are developed into monoculture plantations of commercial species. (Shiva, 1988, p. 04)

সহায়কপঞ্জি

আলাওল। (২০১৩)। *পদ্মাবতী*। [সম্পা. সৈয়দ আলী আহসান], আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা।

কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৮)। 'নারী', সাম্যবাদী। *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

কামরুজ্জামান, জাহাঙ্গীর (২০১৯)। 'শহীদুল জহির : তার গল্পের পতনশীল মানুষেরা'। *পরানকথা*, [সম্পা. তাশরিক-ই-হাবিব], কথাশিল্পী শহীদুল জহির সংখ্যা, খণ্ড : ১০।

কিন্নর রায় (২০১৩)। 'শহীদুল জহিরের গল্প : তৃতীয় বিশ্বের ময়না-শালিক'। *শহীদুল জহির সমগ্র* [সম্পা. ও সংক. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ], পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

জাহিরুল হাসান (প্রকাশকাল অনুল্লেখিত)। 'অপরীকরণ : হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গে'। *অপর : তত্ত্ব ও তথ্য* [সম্পা. অরবিন্দ প্রধান], হাওয়া ৪৯ প্রকাশনী, কলকাতা।

তপোধীর ভট্টাচার্য (২০২৪)। 'ইকো-ফেমিনিজম: সংজ্ঞা থেকে পরিধির খোঁজে'। *বাংলা কবিতা ও পরিবেশ ভাবনা* [সম্পা.রিনি গঙ্গোপাধ্যায়], ইতিকথা, কলকাতা।

ইউনুস, মুন্সী মহম্মদ, (২০০৯)। 'নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব : একটি নিবিড় পাঠ'। *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা* [সম্পা. নবেন্দু সেন], রত্নাবলী, কলকাতা।

আবদুল হাই, মুহম্মদ ও ডক্টর আহমদ শরীফ। (২০১৮)। *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা।* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১৬)। 'বলাই'। *রবীন্দ্র-রচনাবলি*, একবিংশ খণ্ড, [সম্পা. সৈয়দ আকরম হোসেন], ঐতিহ্য, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১৬)। 'বনবাণী'। *রবীন্দ্র-রচনাবলি*, ত্রয়োদশ খণ্ড, [সম্পা. সৈয়দ আকরম হোসেন], ঐতিহ্য, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১৬)। 'গীতবিতান'। *রবীন্দ্র-রচনাবলি*, ঊনত্রিংশ খণ্ড [সম্পা.সৈয়দ আকরম হোসেন], ঐতিহ্য, ঢাকা।

শহীদুল জহির (২০১৩)। *শহীদুল জহির সমগ্র* [সম্পা. ও সংক. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ], পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

সালাহউদ্দীন আইয়ুব। (১৯৯৬)। *অরিয়েন্টালিজম ঔপনিবেশিকতা ও সাংস্কৃতিক বিতর্ক*। দেশ প্রকাশন, ঢাকা।

সুদক্ষিণা বসু (২০২৪)। 'পৃথিবীমঙ্গল ও বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর কবিতা'। *বাংলা কবিতা ও পরিবেশ ভাবনা* [সম্পা. রিনি গঙ্গোপাধ্যায়], ইতিকথা, কলকাতা।

Baudrillard, jean. (1983). *Simulacres and Simulation*, Sheila Faria Glaser [trans.], The University of Michigan Press.

Birkeland, Janis (1993). `Ecofeminism: Linking Theory and Practice', *ECOFEMINISM WOMEN, ANIMALS, NATURE*, GRETA GAARD [Etd.], Temple University Press.

Gruen, Lori (1993). Dismantling Oppression: An Analysis of the Connection Between Women and Animals', *ECOFEMINISM WOMEN, ANIMALS, NATURE*, GRETA GAARD [Etd.], Temple University Press.

Gruen, Lori (2014). `Facing Death and Practicing Grief', *ECOFEMINISM*, CAROL J. ADAMS & LORI GRUEN [Edt.], BLOOMSBURY.

Mies, Maria. (1986). *Patriarchy and Accumulation on a world scale.* Zed Books ltd.

Mies, Maria & Shiva,Vandana. (1993), *Ecofeminism*. Zed Press.

Shahidullah, Dr. Muhammad. (1966). *Buddhist Mystic Songs*, Bangla Academy.

Shiva,Vandana (1988). *Staying Alive : Women, Ecology and Development*, Zed Book ltd.

Smith, Andy (2014). 'Ecofeminism through an Anticolonial Framework', *Ecofeminism WOMEN . CULTURE. NATURE*, Karen J. Warren (edt.) RAWAT PUBLICATIONS.

Spivak, Gayatri Chakravorty (1994). 'Can the Subaltern Speak?'. *Colonial Discourse and Postcolonial Theory : A Reader*. Patrick Williams and Laura Chrisman, [Edt.] Harvester Wheatsheaf.

Starhawk (1990). 'Power, Authority, and Mystery : Ecofeminism and Earth-Based Spirituality'. *In Weaving the Visions: New Patterns in Feminist Spirituality*. Judith Plaskow and Carol P. Christ, [Edt.], Harpercollins.

Warren, Karen J. (2000). *Ecofeminist Philosophy A Western Perspective What It Is And Why It Matters*. Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Lanham, Boulder, Oxford.

Warren, Karen J. (2014), `Taking Empirical Data Seriously: An Ecofeminist Philosophical Perspective'. *Ecofeminism WOMEN. CULTURE. NATURE,* Karen J. Warren [Edt.], RAWAT PUBLICATIONS.

Young, Robert J.C. (2003). *POSTCOLONIALISM A Very Short Introduction*. Oxford University Press.